আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

১২৮

মাসিক

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

৩৭ তম সংখ্যা মার্চ '১০

গাউছুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর রওজা শরীফ, ইরাক

প্রচারে

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail : hafej_ma.jalil@yahoo.com. Website: http:// Sunnibarta.wordpress.com

নং- জেপ্রচা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

১২৮

১২.০০ টাকা মাত্র

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রহ:)
এম.এম_এম.এ_বিসিএস

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ্ আজহারী
মোবাইল : ০১৭১১৪৬৪৫৩৭

সহকারী সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল
প্রকাশনা সম্পাদক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
মোবাইল : ০১৮১৯-৪০৪৭৬৬

নির্বাহী ও সার্কুলেশন সম্পাদক
মোহাম্মদ আব্দুর রব
অর্থ সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
যুগ্ম-পরিচালক (অবঃ) বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন : ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

টাকা প্রেরণ ও যাবতীয় যোগাযোগ ঠিকানা
মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড় " ১৩২/৩ আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন : ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬
E-mail:sunnibarta11@yahoo.com

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা

প্রশ্ন উত্তর ও ফতোয়া বিভাগ
মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ
অধ্যক্ষ আল্লামা শেখ আব্দুল করীম সিরাজনগরী
পীরে তরীকত হাফেয মাওলানা আবদুল হামিদ আল-কাদেরী
পীরে তরীকত আল্লামা আবুল বশর আল কাদেরী
অধ্যাপক আলহাজ্ব এম.এ. হাই
ড: আজিজুর রহমান চৌধুরী
ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন
পীরে তরীকত মানযুর আহমেদ রেফায়ী
পীরে তরীকত অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম

সহযোগিতায়
কাজী মাওলানা মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী, আলহাজ্ব মাওলানা সেকান্দার হোসেন আল-কাদেরী, মাওলানা আবু সুফিয়ান আবেদী আল-কাদেরী, এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসাইন পাটোয়ারী আশরাফী, অধ্যক্ষ ড: এম.এম. আনোয়ার হোসাইন এ্যাডভোকেট, মুহাম্মদ জামাল মিয়া, মুহাম্মদ আবদুল মতিন, মুহাম্মদ হাশেম, আমিনুল ইসলাম তালুকদার, আবুল হোসেন, নূরে আলম, শাকের আহমদ, আবুল হাশেম, আবদুল আজিজ, আবদুল মালেক, মৌলভী মোহাম্মদ আবুল খায়ের , আবু তাহের, মহিউদ্দীন, আবু সাঈদ।

সৌজন্য হাদিয়া ঃ
বাংলাদেশ (প্রতি কপি) ১২ টাকা মাত্র
যুক্তরাজ্য (বার্ষিক) £2.00
যুক্তরাষ্ট্র (বার্ষিক) $ 24.00
সৌদীআরব (বার্ষিক) S.R. 48.00
কুয়েত (বার্ষিক) Dinar 12.00
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (বার্ষিক) Euro 15.00

প্রচারে ঃ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

Pdf by Masum Billah Sunny
sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ---------- - ০২

জলীলুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন- ০৩

গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রা:) : জীবন ও কর্ম - ১০

আল্লাহ ওয়ালাদের নামাযের দৃষ্টান্ত .... - ১৯

হুজুর গাউসে পাকের কতিপয় কারামত - ২০

হযরত বদর শাহ্ (রহ:) ও মুসলমানদের প্রথম চট্টগ্রাম বিজয় ..... - ২৩

সিরাতে বন্ধী অবস্থায় পবিত্র আহলে বাইত-ই রসূল ..... - ৩০

ওরা বাতিল ৩১

Seven Wonders of the Earth ৩২

সুন্নীবার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

* দেশী এজেন্সী : ন্যূনতম ১০ কপি - ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ। এক মাসের টাকা অগ্রীম জামানত।
* বিদেশী এজেন্সী : ন্যূনতম ৫ কপি - ৪০% কমিশন। রেমিটেন্সের মাধ্যমে ০০৫০১২১০০১০৫৩৪১ ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন। (তিন মাস অন্তর)
* বিদেশী গ্রাহক : বার্ষিক-£12.00, $24.00, SR 48.00, EURO 15.00 & KD 12.00।
* দেশী গ্রাহক : (রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে) বার্ষিক ২০০ টাকা মানি অর্ডার যোগে অগ্রিম টাকা প্রেরণ।
* নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জেলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

বিদেশী গ্রাহকদের রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যাংক একাউন্ট

Md. Abdur Rab
SB A/C 00501210010534 1
United Commrcial Bank Ltd.
Mohammadpur Branch, Dhaka-1207

দেশী গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং মানি অর্ডারের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ
সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন : ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

সম্পাদকীয়

ইসলামের সোনালী যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে মুসলিম দেশসমূহে রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচারীতা ব্যাপকতা লাভ করে, ধর্ম ও নীতির দিক থেকে মুসলমানরা উদাসীন ও নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে এমন সংকটময় সময়ে এ ধরণীতে জিলান শহরের বুকে তশরীফ আনে মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রাব্বানী শেখ সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)। বাগদাদ একদিকে সুখ-সম্পদ ও কৃষ্টি সভ্যতার চরম শিখরে উঠেছিল, অন্যদিকে অনাচার, উচ্ছৃংলতা ও ভোগ বিলাসিতার লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। খলিফা থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত কারো কাছে ধর্মীয় রীতি-নীতি মানার খুব একটা বালাই ছিল না। এমন চরম সন্ধিক্ষণে বিশ্ববুকে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)'র আগমনে ইসলামের আকাশে দেখা দেয় সত্যের দীপ্যমান সূর্যালোক। আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে সঞ্চার হলো নব চেতনার।

পীরানে পীর হযরত গাউসে পাক (রহঃ) ইসলাম বিরোধী এবং ইসলামের মুখোশধারী ভ্রান্ত মতবাদীদের ষড়যন্ত্রের জাল নিশ্চিহ্ন করেন প্রজ্ঞা, যুক্তি, লেখনী, বক্তৃতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে। তাঁর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য শুনার জন্য পঙ্গপালের ন্যায় চারিদিক থেকে ছুটে আসত অগণিত মানুষ। সভাস্থলে তিল ধারণের ঠাই থাকত না। গাউসে পাকের অমীয় বাণী শোনার জন্য পীর-সাধক, আলেম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গভর্ণর, উজির-নাজির এবং দেশের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গসহ সর্বস্তরের লোক উপস্থিত হতেন এবং তাঁর অমূল্য শিক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হতেন। এভাবে মৃতপ্রায় সমাজকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন। হযরত গাউসে পাক (রহঃ) রচিত গুনিয়াতুত তালেবীন, ফতহুল গায়েব, আল ফতহুর রাব্বানী প্রভৃতি মুসলামানদের জ্ঞান, চিন্তা, বিকাশে এক মহা শ্লোক সম্বলিত এ কৃসিদায়ে গাউসিয়া আল্লাহ প্রেমের মহিমায় প্রোজ্জ্বল। এটা যে আল্লার ইশক ও মুহাব্বতে নিমজ্জিত বা ফানাফিল্লাহ অবস্থায় রচিত তা অন্তরচক্ষু দিয়ে দেখলে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। হজরত গাউসে পাক (রহঃ) অনুধাবন করেন আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নৈকট্য হাসিলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা জবানী ইলম যথেষ্ট নয় অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য প্রয়োজন কলবী ইলম। সেজন্য সূচনা করেন ত্বরীকার যা সারাবিশ্বে ব্যাপ্তি লাভ করেছে এবং তা কাদেরিয়া ত্বরীকা নামে সুবিদিত। পীরানে পীর (রহঃ) এ পৃথিবী থেকে পর্দা করার পর তাঁর প্রিয় খলিফাবৃন্দ এ ত্বরীকার প্রচার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন।

হযরত গাউসে পাক (রহঃ) এর প্রবর্তিত ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার যে শিক্ষা তা চর্চার মাধ্যমে যেন আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মেলীত হয় তাঁর প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক সাধনায় আমরা যেন নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি, সর্বোপরি সিলসিলার আলোকোজ্জ্বল পথে নিজেদের গড়ে তুলে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সন্তুষ্টি ও তার শাফায়াত লাভের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হতে পারি আসন্ন ফাতেহা-এ ইয়াজদাহুম উপলক্ষ্যে এই কামনা।

জলীলুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল

(১২৭ এর পর)

وَلَاتَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (৪২)

সরল অর্থ : ৪২. "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপনও করো না।"

পূর্ব আয়াতের সাথে সংযোগ :

১. পূর্ব আয়াতে ইয়াহুদী পণ্ডিতদের বলা হয়েছিলো- তোমরা ঈমান আনয়ন করো আখেরী নবী ও আখেরী কিতাবের উপর এবং প্রথম কাফের সাজিও না। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, সত্যমিথ্যা একত্র করে অন্যকে গোমরাহ্ করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না। সুতরাং উভয় আয়াতের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে।

২. পূর্ব আয়াতে বলা হয়েছিল- স্বল্পমূল্যে আমার আয়াতসমূহ বিক্রি করে দিও না। বর্তমান আয়াতে তার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয়েছে, মাল ও মূল্য নিয়ে সত্য গোপন করো না।

৩. ইয়াহুদী পণ্ডিতগণ তিনটি অপরাধ করেছিল। টাকা-পয়সা নিয়ে আয়াতসমূহ পরিবর্তন করে ফেলতো। নিজেদের পক্ষ হতে কিছু যোগ করা হতো। নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী তৌরাতের আয়াতসমূহ গোপন করে ফেলতো। ৪১ নম্বর আয়াতে প্রথমটি থেকে বারণ করা হয়েছে এবং বর্তমান ৪২ নম্বর আয়াতে বাকি ২টি থেকেও বারণ করা হয়েছে।

খোলাসা তাফসীর :

ইয়াহুদী পণ্ডিতরা দু'ভাবে লোকদের ঈমান গ্রহণ থেকে বিরত রাখতো। যেসব ইয়াহুদী ছিল অজ্ঞ তাদের কাছে সত্য জিনিস প্রকাশই করতো না। আর যারা ছিলো সতর্ক ও বিবেচক তাদের সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিতো অথবা তৌরাতের আয়াতসমূহে সত্য মিথ্যা মিশ্রিত করে দিতো অথবা উলটা-পালট ব্যাখ্যা করতো। এতে করে অজ্ঞ ও সতর্ক- উভয় শ্রেণীকে ইসলাম ও আখেরী নবী সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিতো। অজ্ঞ ও জাহেল লোকদের বলতো- আখেরী নবী সম্পর্কে আমাদের তৌরাতে কিছুই উল্লেখ নেই। আর সতর্ক লোকদের বলতো- শেষ নবীর কথা উল্লেখ আছে সত্য কিন্তু তাঁর যেসব গুণাবলী আমাদের কিতাবে বর্ণিত আছে সেসব গুণাবলী তো এই নবীর মধ্যে নেই। সুতরাং তিনি সেই প্রতিশ্রুত নবী নন। তাই অত্র আয়াতে ইয়াহুদী পণ্ডিতদের সাবধান করে বলা হচ্ছে- হে পণ্ডিতগণ। তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যা মিশ্রিত করো না এবং সত্যকে গোপনও করো না। জেনে শুনে তোমাদের এসব করা অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ। ঐ যুগে তৌরাতের কোন হাফেয ছিল না এবং কিতাব ছাপানোর ব্যবস্থাও ছিল না। তাই হাতে গোনা কয়েকজন পণ্ডিত ছাড়া সাধারণ লোকেরা ছিল অজ্ঞ ও অর্ধ অজ্ঞ। এজন্য পণ্ডিতরা অতি সহজেই তাতে পরিবর্তন করতে পারতো। যেমন- হিন্দুদের বেদ সম্পর্কে সাধারণ হিন্দুরা একেবারেই অজ্ঞ। হিন্দু পণ্ডিতরা বেদ পাঠ করে যেকোন রকমে উলটপালট ব্যাখ্যা দিয়ে লোকদের তাদের মুঠোর মধ্যে রাখতো। এক শ্রেণীর মুসলমানও বর্তমানে কোরআনের উলটপালট ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। জনগণ তাদের মিষ্টি কথায় পথহারা হয়ে যাচ্ছে। সুন্নী উলামাদের কাছে এক রকম ব্যাখ্যা শুনে এবং বাতিলপন্থীদের কাছে অন্য রকম। তাই তারা হতাশা প্রকাশ করে বলে- আমরা কোন্ দিকে যাবো? আল্লাহ্পাক কোরআন মজিদকে হেফাযত করার জন্য হাফেযুল কোরআন বানিয়েছেন। পঠনরীতি ঠিক রাখার জন্য ক্বারী এবং সঠিক ব্যাখ্যাদানের জন্য হাক্কানী মুফাসসির সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের গোপনভেদ উদ্ধারের জন্য সূফী সাধক আলেম পয়দা করেছেন। লোকদের উচিত- সঠিক মানুষ অনুসন্ধান করে তাকে অনুসরণ করা, তাদের লিখিত কিতাবাদি অনুসরণ করা, তাদের কর্মের অনুসরণ করা। এতেই রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গল। যদি এতে ভুল করে- তাহলেই সর্বনাশ।

শিক্ষণীয় বিষয় :

১. অত্র আয়াত ইয়াহুদী পণ্ডিতদের শানে নাযিল হলেও বর্তমানের কিছু মুসলমান পণ্ডিতও এর অন্তর্ভুক্ত- যারা

কোরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যার মধ্যে মনগড়া কথা ঢুকিয়ে দেয়। তারা কোরআনের মূল ভাষ্যকে পরিবর্তন করে ফেলে। তারা ইসলামের মৌলিক আকিদা ও নীতিমালার পরিপন্থী কোরআনের ব্যাখ্যা করে। যেমন- হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে বলে- তিনি একটি গুনাহ্ করে তিনশত বছর কেঁদেছিলেন। অতএব তোমরাও কাঁদো (চরমোনাই)। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলে- "তিনি আল্লাহ্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথম দিকে তিনটি শিরকি কাজ করেছিলেন। তিনি তারকা, চন্দ্র ও সূর্যকে রব বা আল্লাহ্ বলে প্রথমে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য সঠিক সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই আল্লাহ্ তাঁর শিরকি গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অনুসন্ধানীদের জন্য মাঝপথে এরূপ ভুল হতেই পারে। তবে তা ধর্তব্য নয়" (মউদুদী)। অন্য এক শ্রেণীর আলেমরা বলে- আশুরার দিনে আমাদের প্রিয়নবীর পূর্বাপর গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়েছে (দেওবন্দী ওহাবী জামাত ও গোলাবী ওহাবী পীর)। অথচ ইসলামী আকিদা হলো- "নবীগণ শিরকি গুনাহ্, কবিরা গুনাহ্ এবং সগীরা গুনাহ্ হতে আজীবন নিষ্পাপ।" তাই এসব ইয়াহুদী স্বভাবের তথাকথিত মুসলিম পণ্ডিতদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

২. কোন কোন মুসলিম নামধারী পণ্ডিত বলে থাকে- "খাতামুন নাবিয়্যীন" অর্থ শেষ নবী নয় বরং মূল ও আসল নবী। তাঁর পরে আরো নবীর আগমন হতে পারে (গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও কাশেম নানুতবী)। এরা কোরআনের মূল ভাষ্যকে পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং ইসলামী মৌলিক আকিদার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাই তারা কাফের (হোসসামূল হারামাঈন)।

৩. অত্র আয়াতে ঐসব আলেম অন্তর্ভুক্ত যারা হিন্দুদের মনোরঞ্জনের জন্য ইসলামী বিধানের পরিবর্তন করে। যেমন দেওবন্দী আলেমগণ ২০০৮ সালে ফতোয়া জারি করেছে যে, হিন্দুস্তানে গরু দিয়ে কোরবানী করা হারাম এবং তার গোস্ত খাওয়াও হারাম। যেহেতু সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে (উক্ত ফতোয়া দৈনিক ইনকিলাবে ছাপা হয়েছে)।

কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর :

প্রথম প্রশ্ন : অত্র আয়াতে বুঝা যাচ্ছে- জেনেশুনে গুনাহ্ করা হারাম। না জেনে যা মনে চায় তাই করো- কোন পাপ হবে না।

উত্তর : জেনে গুনাহ্ করা এবং না জেনে গুনাহ্ করা উভয়ই হারাম। তবে জেনেশুনে হালাল মনে করে গুনাহ্ করা কুফরী। ইহুদীরা তাই করতো।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা গেল- এলেমের চাইতে মূর্খতাই উত্তম। কেননা, না জেনে গুনাহ্ করা শুধু গুনাহ্ কিন্তু জেনে গুনাহ্ করা কুফরী। তাই না জানাই উত্তম।

উত্তর : না জানা ও গুনাহ্ করা ডবল অপরাধ। কেননা, ভালমন্দ জানা ফরয ছিল। কিন্তু সে তা শিখেনি। তাই ফরয তরকের গুনাহ্ হয়েছে। অপরটি হলো গুনাহের কর্ম। অপর দিকে শিক্ষিত গুনাহ্গারের গুনাহ্ একটি। এ হিসাবে তার পাপ একটি।

মনে রাখতে হবে, আকিদার ক্ষেত্রে না জানার ওযর আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কোন মূর্খ লোক যদি কুফরী করে বসে আর ধরা পড়ে গেলে বলে- আমি এ সম্পর্কে জানি না- তাহলে তার ওযর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। তাকে কুফরীর শাস্তি ভোগ করতেই হবে। যেমন- কেউ বিনা টিকেটে রেল ভ্রমণ করে ধরা পড়ে যদি বলে- আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না তাহলে তাকে মাফ করা যাবে না। তদ্রূপ- না জেনে কুফরীর কথা বললে বা কুফরী কাজ করলে অপরাধ ক্ষমা হবে না বরং কুফরীর শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

কিছু শাব্দিক বিশ্লেষণ :

১. হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য : অত্র আয়াতে হক্বকে বাতিলের সাথে সংমিশ্রিত করতে নিষেধ করা হয়েছে। হক্ব অর্থ কি এবং বাতিল অর্থ কি? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা?

হ্যাঁ, আছে। ১. হক্ব বলা হয়- যা বাস্তব সম্মত ২. বাতিল হলো বাস্তবের বিপরীত। গলদ আক্বিদাকে বাতিল বলা হয়। কেননা, এটা বাস্তবের বিপরীত। শুদ্ধ আক্বিদাকে হক্ব বলা হয়। কেননা, তা বাস্তবসম্মত। ৭২ ফেরকাকে বাতিল ফেরকা এজন্য বলা হয়- যেহেতু তাদের আক্বিদা বাস্তবসম্মত নয়। অপরদিকে- আহ্লে সুন্নাতকে হক্ব বলা হয়। কেননা, তা বাস্তব সম্মত।

২. وَلَا تَكْتُمُوْنَ মূলতঃ ছিল وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ মুদারি মুনফী হওয়ার কারণে لَا تَلْبِسُوْنَ এবং الْحَقَّ

وتكتمون উভয় শব্দ হতে ن বাদ দেয়া হয়েছে। অর্থ হলো- "সত্যের সাথে মিথ্যা মিশাইওনা এবং সত্যও গোপন করিও না।" সবসময় সত্যের সাথে বাতিলকে মিশ্রিত করে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। কিন্তু বাতিলকে সব সময় গোপন রাখা হয়। এটাই মূল পার্থক্য। ইয়াহুদী পণ্ডিতরা উভয় প্রকার অপরাধ করতো। তারা কোন কোন সময় কিছু সতর্ক লোকের কাছে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে কথা বলতো এবং সব সময় জাহেল মূর্খদের থেকে সত্যকে গোপন করে রাখতো। আল্লাহ্পাক উভয় অপরাধ থেকে বিরত থাকার জন্য ইয়াহুদী পণ্ডিতদের নির্দেশ দিয়েছে।

৩. وانتم تعلمون অর্থাৎ- "তোমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিচয় জেনেশুনে কোন সময় সত্য মিথ্যা একসাথে করে প্রচার করছো এবং কোন সময় সত্যকে আদতেই গোপন করে রাখছো। এটা জঘন্য অপরাধ। না জেনে অজ্ঞতার কারণে কোন অপরাধ করলে তা ক্ষমার যোগ্য হয়। যেমন- কোন হাফেয ভুল করে এক আয়াত বাদ দিয়ে সামনে অগ্রসর হলো। কোন লেখক অজ্ঞাতসারে কিছু শব্দ বাদ দিল। কোন পাঠক কোন আয়াতের ভুল অর্থ বুঝেছে। কোন মুজ্তাহিদ ভুলক্রমে কোন মাছআলা লিখেছেন। এসব ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করলে তা আর ক্ষমার যোগ্য থাকে না। ইয়াহুদী পণ্ডিতরা নবীজীর সিফাত ও পরিচয়ের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে দুনিয়ার স্বার্থে পরিবর্তন করতো। এটা পরিষ্কার কুফরী কাজ।

কোরআন মজিদে এসব ত্রুটি নেই। কেউ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যে কোন ভুল করলে সাথে সাথে তার প্রতিবাদ হয়। লক্ষ-কোটি হাফেয ও আলেম উলামা কোরআন মজিদকে অক্ষত রাখতে সহায়তা করছে। তাঁরা কোরআনের সেবক, আল্লাহ্র খাদেম এবং আসমানী কিতাব সংরক্ষণের রেকর্ড কিপার বা হাফেয। ক্বারীগণ বিশুদ্ধ পঠনের সেবক। হাফেযগণ আপন সিনায় কোরআন সংরক্ষণকারী। আলেমগণ কোরআনী আহ্কাম হেফাযতকারী। সূফী সাধকগণ আসরারুল কোরআন বা সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশকারী। সুতরাং কোরআন মজিদ যেকোন পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত। যারা স্বেচ্ছায় কোরআনী আয়াতের অর্থ ও প্রকৃত মর্ম পরিবর্তন করে বা বিকৃত করে তারা ইয়াহুদীদের দোসর এবং তাদের নতুন প্রজন্ম।

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين (٤٣)

সরল অর্থ : ৪৩. "আর তোমরা নামায কায়েম করো যাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।"

পূর্বাপর যোগাযোগ :

এর পূর্বে ইয়াহুদী পণ্ডিতদের ঈমান আনার আহ্বান জানানো হয়েছিল। এখন আহ্বান জানানো হচ্ছে আমলের অর্থাৎ নামায, যাকাত ও জামাতের। বুঝা গেল- প্রথমে ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে- পরে আমলের। ঈমান হলো দাওয়াত- আমল হলো আনুষঙ্গিক। নিজে কুফরী করা যেমন কুফর তদ্রূপ অন্যকে বিরত রাখা বা বিরত থাকতে প্ররোচিত করা সবই কুফরী কাজ। ইয়াহুদীরা সবই করেছে। পূর্ব আয়াতে বলা হয়েছিল- তোমরা কুফরী করে পৃথক দল করে রেখেছো। বর্তমান আয়াতে বলা হচ্ছে- কুফরী ছেড়ে ঈমান এনে বিধি বিধান মেনে মুসলমানদের জামাআতভুক্ত হয়ে যাও। নামায পড়ো দলবদ্ধভাবে মুসলমানদের সাথে জামাআতে। ইয়াহুদীদের মধ্যে তিনটি ত্রুটি ছিল ১. আত্মম্ভরিতা ২. সম্পদের সীমাহীন লোভ ৩. পরশ্রীকাতরতা। অত্র ৪৩ নং আয়াতে উক্ত তিনটি রোগের মহৌষধ বাতলানো হচ্ছে। যথা- নামায, যাকাত ও জামাআত। নামায অহংকার বিনাশ করে মানুষকে বিনত করে। যাকাত মানুষকে লোভ থেকে বিরত রাখে এবং মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ করে। জামাআতে নামায আদায়ে পরশ্রীকাতরতা দূর হয়। তাই তোমরা ঈমান এনে নবীজীর হাসপাতালে ভর্তি হয়ে তিনটি রোগ নির্মূল করো তিনটি ওষুধ ব্যবহার করো- নামায, যাকাত ও জামাআত।

খোলাসা তাফসীর :

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত প্রথমে বনী ইসরাঈল ইয়াহুদীদের ঈমানের আদেশ দিয়ে এবার আহ্বান জানাচ্ছেন আমলের। তারা যেন মুমিন হয়ে আমল করে। আমলের মধ্যে নামায, যাকাত ও জামাআতে নামায আদায়ের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই ইসলামী নামায, যাকাত ও জামাআত হলো বনী ইসরাঈলদের নামায, যাকাত ও জামাআত থেকে ভিন্নতর। তাদের নামায ছিল

রুকুবিহীন। তাদের যাকাত ছিল অতিরিক্ত সম্পদের এক-চতুর্থাংশ। নামাযে ছিল না রুকু ও জামাআত। আল্লাহ্পাক অত্র আয়াতে মুসলমানী নামায, মুসলমানী যাকাত, মুসলমানী জামাআতসহ নামায আদায় করার জন্য ইয়াহুদীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন- নামায কায়েম করো। নামায অশ্লীলতা ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং মনকে করে বিনত ও নরম। যাকাত ও সাদ্কা মালকে পবিত্র করে, বরকতপূর্ণ করে এবং ঘরকে করে নিরাপদ। পরকালে এই যাকাত মানুষের ত্রুটিসমূহ গোপন রাখতে সাহায্যে করবে, হাশর ময়দানের গরম থেকে রক্ষা করবে এবং জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হবে (তাফসীরে কবীর)। রুকুকারীদের সাথে রুকুকারী হওয়ার অর্থ মুসলমান হয়ে রুকুসহ মুসলমানী নামায আদায় করা। ইয়াহুদী নাসারাদের নামাযে রুকু নেই। তাই এখন তাদের রুকুবিহীন নামায বাতিল। রুকু সম্বলিত মুসলমানী নামায আদায় করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আল্লাহ্ তায়ালা। রুকুকারীদের সাথে রুকুকারী হওয়ার আরেক অর্থ- জামাআতে নামায আদায় করা। পাঞ্জেগানা নামাযের জামাআত হলো সুন্নাতে মোয়াক্কাদা বা ওয়াজিব। দুই ঈদ ও জুমার জামাআত হলো ফরয এবং তারাবিহ্ ও ইস্তিস্কা নামাযে জামাআত হলো সুন্নাত। আল্লাহ্পাক তাদের নামায ও যাকাতের দিকে আহ্বান জানানোর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে- যেভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে বদনী ইবাদতের মাধ্যমে, তদ্রূপ তাঁর ইবাদত করতে হবে মাল দিয়ে সামাজিকভাবে। গরিব এতিম ও নিঃস্ব মানুষের সেবা করা ফরয। তাই যাকাতও ফরয। হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল ইবাদ- উভয়টি ইবাদত এবং সমান ফরয। যে ব্যক্তি শুধু হক্কুল্লাহ্ আদায় করলো কিন্তু হক্কুল ইবাদ বাদ দিল সে ফরয তরক করলো। তার নামায কবুল হবে না।

অত্র আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয় :

১. ঈমান হলো আমল থেকে উত্তম ও মূল। ঈমানবিহীন আমল বেকার ও মূল্যহীন। আমলের মধ্যে নামায হলো সর্বোত্তম ইবাদত। ঈমান থাকে ক্বলবে আর আমল থাকে শরীরে ও দেহে। দেহ হতে ক্বলব উত্তম- সুতরাং আমল হতে ঈমান উত্তম।

২. নামাযের সাথে যাকাতের উল্লেখ থাকায় বুঝা গেল নামাযের পরেই যাকাতের স্থান। নামায হলো আল্লাহ্র হক্ব এবং যাকাত হলো বান্দার হক্ব। আল্লাহ্র হক্বের পূর্বেই বান্দার হক্ব অগ্রগণ্য। নামায যেমন ফরয, যাকাতও ফরয। একটি অস্বীকার করে অন্যটি করলে কবুল হবে না।

৩. ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান ও হুকুম আহ্কাম যমীনে নাযিল হয়েছে কিন্তু নামায নাযিল হয়নি বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা লা-মাকানে আপন হাবীবকে নামায হাদীয়া স্বরূপ দান করেছেন। নামায হলো বেহেস্তের কুঞ্জী বা চাবি। সুতরাং ঈমানের পরই নামাযের স্থান।

৪. যাকাত রোযা হতে উত্তম। কেননা, যাকাত দ্বারা অন্যে উপকৃত হয়- রোযা দ্বারা কেবল নিজে উপকৃত হয়। যাকাতের মধ্যে সামাজিকতা আছে। তদুপরি- নামায ও যাকাত কাজের নাম। কিন্তু রোযা কাজের নাম নয় বরং পানাহার ও যৌনচর্চা থেকে তথা বিশেষ কর্ম থেকে বিরত থাকার নাম। বিরত থাকার চেয়ে কাজ করা উত্তম। সুতরাং রোযা হতে যাকাত উত্তম। যদিও রোযার অন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সে কারণে অন্য ইবাদত থেকে রোযার প্রতিদানও আলাদা।

৫. জামাতে নামায আদায় করলে কবুল হওয়ার পূর্ণ আশা রয়েছে। একার মধ্যে গ্যারান্টি নেই।

৬. রুকুকারীদের সাথে রুকু করার অর্থ দুটি। একটি অর্থ হলো রুকুওয়ালা নামায অর্থাৎ মুসলমানী নামায। ইহুদী খৃষ্টানদের নামাযে রুকু নেই। দ্বিতীয় অর্থ হলো- জামাআতের সাথে নামায আদায়। আল্লাহ্র এই আদেশের হুকুম এক এক নামাযে এক এক রকম হবে। পাঞ্জেগানা নামাযে জামাতের এই আদেশ হবে সুন্নাতে মোয়াক্কাদা বা ওয়াজিব। দুই ঈদ ও জুম'আ এবং জানাযা নামাযে এই জামাআত হলো ফরয। তারাবিহ্ ও কুসুফ-খুসুফ এবং ইস্তিস্কার নামাযে জামাআত হলো সুন্নাত। অত্র আয়াতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে- তাহলো রুকুতে শামিল হলেই পূর্ণ রাকআত গণ্য হবে।

কিছু শাব্দিক তত্ত্ব :

১. اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ অর্থ- পূর্ণভাবে নামায আদায় করা। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মোস্তাহাবসহ ১৩৭টি উপাদান যোগে নামায আদায় করার নাম اِقَامَةُ الصَّلٰوة বা পূর্ণাঙ্গ নামায কায়েম করা। যারা বলে- সমাজে ও রাষ্ট্রে নামায

প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে অত্র আয়াতে তারা ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজে বা রাষ্ট্রে নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারলে উত্তম কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। অত্র আয়াতে যেহেতু ইয়াহুদী পণ্ডিতদের সম্বোধন করা হয়েছে সেহেতু নামায অর্থ মুসলমানী নামায হবে। কেননা, ইয়াহুদীদের নামাযের ধরণ ছিল অন্য রকম। আর যাকাতের যে হুকুম দেয়া হয়েছে তাও তাদের যাকাত থেকে ভিন্ন। ইয়াহুদীদের উপর যাকাত ফরয ছিল সম্পদের চার ভাগের একভাগ। ইসলামের যাকাত অতি সহজ- চল্লিশ ভাগের একভাগ। তাদের নামায হলো রুকুবিহীন আর মুসলমানের নামায হলো রুকুর অধীন। তাদের নামায একা একা কিন্তু মুসলমানের নামায জামাআতের সাথে আদায় করা উত্তম। তাই তাদের নামায, যাকাত ও রুকু করার নির্দেশের অর্থ হলো বিশেষ ধরনের নামায, বিশেষ ধরনের যাকাত এবং বিশেষ ধরনের রুকু। অতএব اَلصَّلٰوة ـاَلزَّكٰوة ـاَلرُّكُوْع এই তিনটি শব্দের মধ্যে الف لام অর্থ عهد خارجى বা বাস্তব ও প্রচলিত নামায, যাকাত ও রুকু। এটি নাহু ছরফের নীতিমালা। আলেম সাহেবানরাই এর তাৎপর্য বুঝবেন। সাধারণ মানুষ এই তত্ত্ব বুঝবে না।

কিছু জিজ্ঞাসা ও তার জবাব :

প্রশ্ন : শাফেয়ী মাযহাব মতে কাফেরদের উপর শরিয়তের বিধান ফরয। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতে কাফেরদের উপর নামায ও রোযা ফরয নয়। অত্র আয়াতে কাফের ইয়াহুদীদের নামায ও যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বুঝা গেল- হানাফী মাযহাবের মত সঠিক নয়- শাফেয়ী সঠিক।

উত্তর : অত্র আয়াতের পূর্বে ঈমান গ্রহণের হুকুম দেয়ার পরেই অত্র আয়াতে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যথা- وآمنوا বুঝা গেল- ঈমান ছাড়া শুধু নামায রোযার হুকুম দেয়া হয়নি। ঈমানের পরেই আল্লাহ্ নামায রোযার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং হানাফী মাযহাবের ব্যাখ্যাই সঠিক- শাফেয়ীর ব্যাখ্যা সঠিক নয়। পরকালে কাফেরদের শুধু প্রশ্ন করা হবে ঈমানের। নামায রোযা তো ঈমানের অধীনে। কিন্তু শাফেয়ী মাযহাব মতে নামায রোযার প্রশ্নও করা হবে। কাফেরগণ বলবে- আমরা জাহান্নামে জ্বলছি এ কারণে যে, আমরা নামায পড়িনি এবং মিছকিনকে খাদ্য দান করিনি। শাফেয়ীগণ বলেন, এতে বুঝা গেল নামায রোযা না করার শাস্তিও ভোগ করতে হবে কাফেরদের। হানাফীরা বলেন, এর অর্থ হলো ঈমান আনিনি এবং নামায রোযা করিনি তাই আমরা জাহান্নামে জ্বলছি। মর্মার্থ হলো- আমরা নামাযী মুসলমানদের সাথী ছিলাম না অর্থাৎ মুসলমান ছিলাম না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ শব্দ দ্বারা বুঝা যায়- জামাআতে নামায পড়া ফরয। কেননা, আল্লাহ্পাক বহু বচনে নামায আদায় করতে নির্দেশ করেছেন।

উত্তর : আল্লাহ্র হুকুম হলেই ফরয বা ওয়াজিব হয় না। আল্লাহ্র নির্দেশ ১৬ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোনখানে ফরয, কোনখানে ওয়াজিব, কোনখানে মোস্তাহাব, কোনখানে মুবাহ্ এবং কোনখানে শুধু পরামর্শের অর্থে امر -এর সিগা ব্যবহৃত হয়। নূরুল আনোয়ার যারা পাঠ করেছেন তারাই জানেন এসব বিষয়। দেখুন- আল্লাহ্ বলেছেন- كُلُوْا وَاشْرَبُوْا অর্থাৎ- তোমরা পানাহার করো। এই নির্দেশ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত বা মোস্তাহাবের জন্য নয় বরং মোবাহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তৃতীয় প্রশ্ন : বছরে দু'বার দুই ঈদের জামাআত ফরয হলো কেন? জানাযা নামাযের জামাআত ফরয হলো কেন? উচিত ছিল শুধু পাঞ্জেগানা নামাযের জামাআত ফরয হওয়া।

উত্তর : দুই ঈদ এবং জানাযার জামাআত না পেলে একলা পড়া নিষেধ। কিন্তু পাঞ্জেগানা নামায জামাআত না পেলেও ফরয। পাঞ্জেগানা নামাযের জামাআত ফরয হলে দৈনিক পাঁচবার জামাতে হাযির হওয়া কষ্টসাধ্য হতো। তাই ফরয মাফ কিন্তু সুন্নাতে মায়াক্কাদা বহাল রাখা হয়েছে- যাতে সাধ্যের অতিরিক্ত চাপ না পড়ে।

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٤٤)

সরল অর্থ : ৪৪. "তোমরা কি অন্য মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদের ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো। তোমাদের কি সামান্য বিবেকও নেই?"

যোগসূত্র :

ইয়াহুদী পণ্ডিতদের প্রথমে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার পর ইসলামী আমলের নির্দেশ দেয়া হয়। বর্তমান আয়াতে তাঁদের হিতোপদেশের নমুনা পেশ করা হচ্ছে। তারা তৌরাত কিতাব পাঠ করে অন্যদের বলতো- তোমরা শেষ নবীর উপর ঈমান এনেছো। এ কাজটি খুবই ভাল। ইসলামে তোমরা দৃঢ় থাকবে। কিন্তু নিজেদের বেলায় তারা ছিল নির্লিপ্ত। লোকেরা তাদের ঈমান গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলতো- আমাদের কিভাবে তাঁর যেসব নিদর্শনের কথা উল্লেখ আছে- তাঁর মধ্যে সবগুলো এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমরা একটু বিলম্ব করছি। আল্লাহ্পাক তাদের বিবেকহীনতা ও পরের হিতোপদেশ প্রদান উল্লেখ করে তাদের তিরস্কার করছেন।

ইয়াহুদী পণ্ডিতরা মনে করতো আমরা এই নবীর উপর ঈমান না আনলেও অন্যদের তো আমরা সৎ উপদেশ দিয়ে মুসলমান বানাচ্ছি। সুতরাং তাদের সাওয়াব তো আমরা অবশ্যই পাবো। আল্লাহ্পাক অত্র আয়াতে তার জবাবে বলছেন, নিজেরা ঈমান না এনে অন্যকে হিতোপদেশ দিলে কোন লাভ হবে না। আগে নিজেরা ঈমান এনে পরে অন্যকে হেদায়াত করলে তবেই উপকারে আসবে (তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান)।

খোলাসা তাফসীর :

আল্লাহ্পাক বলেন, হে ইসরাঈলী পণ্ডিতগণ! তোমরা অন্যকে হিতোপদেশ দিচ্ছো কিন্তু নিজেরা আমল করছো না। আমার নবীর ব্যাপারে ও তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করলেও নিজেরা আমলে নিচ্ছো না। এটা কেমন কথা? তোমাদের কিতাবে কি একথা লেখা নেই- যে ব্যক্তি অন্যকে হিতোপদেশ দেয় কিন্তু নিজে মানে না সে ব্যক্তি খুবই খারাপ প্রকৃতির লোক এবং তার জন্য রয়েছে শাস্তির ব্যবস্থা। সাধারণ বিবেকও তো বলে- অন্যকে উপদেশ দিয়ে নিজে তার প্রতি আমল না করা বিবেকহীনের কাজ। এতে করে উপদেশের কোন প্রভাব হয় না। আলেমে বে-আমলের কথা কানে বাজে কিন্তু আলেমে বা-আমলের কথা হৃদয়ে গাথে। আলেমে বে-আমলের কথায় ফুলঝুড়ি ছড়ায় কিন্তু আলেমে বা-আমলের কথায় মনে চিরস্থায়ী দাগ কাটে। তাই তোমরা মুখের কথায় নয় বরং নিজেরা আখেরী নবীর প্রতি ঈমান এনে এবং সে মোতাবেক আমল করে সততার পরিচয় দাও। তাহলেই তোমাদের হিতোপদেশের মূল্যায়ন হবে এবং কাজে আসবে।

শিক্ষণীয় বিষয় :

১. হিতোপদেশ দানকারীদের উচিত নিজেরা যা আমল করবে তাই অন্যদের বলবে। নিজেরা যা করবে না তা অপরকে করতে বলবে না। কারণ এতে আছর হবে না।

২. মি'রাজ রজনীতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছিলেন, একদল লোকের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এরা বে-আমল ওয়ায়েজ বা হিতোপদেশ দানকারী আলেম।

৩. বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে- হযরত উছামা ইব্নে যায়েদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তিকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে- যার পেটের আঁত বের হয়ে আসবে। সে ব্যক্তি ঐ আঁত নিয়ে এভাবে চক্কর খাবে যেভাবে গাধা চাক্কির চারদিকে ঘুরে। অন্যান্য দোযখীরা বলবে- আপনি বড় বক্তা ও উপদেশ দানকারী ওয়ায়েয ছিলেন এখন আপনার এ দূরবস্থা কেন? সে বলবে- আমি ছিলাম বে-আমল ওয়ায়েয।

৪. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, বে-আমল আলেম চেরাগবাতির মতো যার নিচে অন্ধকার থাকে কিন্তু চতুর্দিকে আলো। সে নিজে জ্বলে শেষ হয়ে যায় অন্যদের আলো দান করে। উচিত ছিল নিজে আলোকিত হওয়া (তাফসীরে কবীর)।

৫. একদল বেহেস্তী লোক একদল দোযখীকে আহ্বান করে বলবে- ব্যাপার কি? আমরা আপনাদের ওয়াজ শুনে বেহেস্তে আসলাম আর আপনারা দোযখে! এর হেতু কী? আফসোস! শাগরিদগণ জান্নাতে আর ওস্তাদ জাহান্নামে? তারা বলবে- তোমাদের ছিল আমল- আমরা তা করিনি (হায়াত মউত কবর হাশর, তায্কিরাহ্ ও তাফসীরে কবীর)।

৬. যারা শুধু কথায় ফুলঝুড়ি ছড়ায় তাদের উপদেশ বেকার। আর যারা নিজের আমল দ্বারা ওয়ায করে, তাদের কথা তীরের ন্যায় অন্তরকে বিদ্ধ করে। সাহাবায়ে কেরাম চরিত্র দিয়ে মানুষের মন জয় করেছিলেন- যার ফলে অল্পদিনের মধ্যে বিশ্বের এক বিরাট অংশ ইসলামের

ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলো। আল্লাহ্‌র অলিগণ সাদাসিদা জীবন ও আদর্শ দিয়ে মানুষের মন জয় করতেন।

৭. তাফসীরে কবীর একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন- ইয়াজিদ ইবনে হারুন নামে জনৈক বিখ্যাত ওয়ায়েজ আলেমে বা-আমল ইন্‌তিকাল করার পর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো- কবরে মুন্‌কার নকীর আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলো? তিনি বললেন- মুন্‌কার নকীর যখন আমাকে প্রশ্ন করলো- তোমার রব কে? তখন আমি বললাম- যিনি হাজারো মানুষকে রবের পরিচয় শিক্ষা দিয়েছে- তাকে এই প্রশ্ন?

কিছু শাব্দিক তাহক্বীক :

১. اتَأْمُرُونَ النَّاسَ "তোমরা কি নির্দেশ করো অন্যকে ভাল কাজের"? এখানে আদ্যাক্ষর হামজা হরফটি প্রশ্নবোধক এবং আশ্চর্যবোধক উভয়টি। অর্থাৎ- কি আশ্চর্যের কথা? তোমরা নিজেরা আমল না করে অন্যকে উপদেশ দিচ্ছো? النَّاسَ অর্থ ইয়াহুদী পণ্ডিতদের আত্মীয়স্বজন, অধীনস্থ ইয়াহুদী ও মক্কার কোরায়েশ। ইয়াহুদী পণ্ডিতরা এই তিন শ্রেণীর লোককে আখেরী নবী সম্পর্কে হিতোপদেশ দিতো কিন্তু নিজেরা ঈমান আনতো না। হিজরতের পূর্বে ইয়াহুদী পণ্ডিতরা মক্কায় এসে বলতো আখেরী নবী এসে গেছেন তোমাদের মধ্যে। অতএব তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনো। অথচ হিজরত করার পর তারাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করে বসলো।

২. اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ "তোমাদের কি বিবেক নেই"? এখানে আদ্যাক্ষর হাম্‌যা প্রশ্নবোধক ও তিরস্কারমূলক। আকল বা বিবেক অন্তরের নূর- যার দ্বারা ভালমন্দ পার্থক্য করা যায়। বিবেক খারাপ হয়ে গেলে ভালমন্দ পার্থক্য করা যায় না। বিবেক বা আকলে মানুষ আর বেআকলে জানোয়ার।

কতিপয় প্রশ্ন ও তার জবাব :

প্রশ্ন : আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল- বে-আমল আলেমগণের ওয়ায করা নাজায়েয। এমনকি কাউকে ভুল করতে বা বলতে দেখা সত্ত্বেও সে তাকে বুঝাতে পারবে না।

উত্তর : আয়াতের উদ্দেশ্য ওয়ায বন্ধ করা নয় বরং ওয়ায অনুযায়ী নিজে যেন আমল করে, এটাই আয়াতের উদ্দেশ্য। ওয়াযের কোন দোষ নেই দোষ হলো ওয়ায়েযের। সুতরাং, তার সংশোধন হওয়াই অত্র আয়াতের মর্ম। আলেমে বে-আমল হওয়া সত্ত্বেও তার প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে হবে। তা না হলে দ্বিগুণ গুনাহ্‌ হবে। প্রথম গুনাহ্‌ হলো নিজে আমল না করার এবং দ্বিতীয় গুনাহ্‌ হলো দ্বীনকে গোপন করে রাখার। বে-আমল আলেমের তুলনা হলো চেরাগের ন্যায়- যার নিচে অন্ধকার কিন্তু চতুর্দিক আলোকিত। অন্যকে আমলের উপদেশ দেওয়া সাওয়াবের কাজ।

প্রশ্ন : গরিব আলেমদের জন্য যাকাত এবং হজ্বের ওয়ায করা উচিত নয়। কেননা, তারা এর উপর নিজেরা আমল করতে পারে না।

উত্তর : বে-আমল অর্থ- সাধ্য থাকা সত্ত্বেও আমল না করা। গরিব আলেমের যাকাত দেয়া ও হজ্ব করার সাধ্য নেই। তাই তিনি বে-আমল বলে গণ্য হবেন না। উদাহরণস্বরূপ- ডাক্তার অন্যকে ওষুধ খেতে বলে। রোগী যদি বলে বসে- ডাক্তার সাহেব আপনি আগে ওষুধ খান, তারপর আমাকে বলবেন- এটা অযৌক্তিক। তদ্রূপ- অক্ষম আলেম যাকাত ও হজ্বের ওয়ায অন্যকে শুনাবেন- নিজে নয়।

চলবে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবির — নারায়ে রিসালাত

আল্লাহু আকবার — ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)

খানকায়ে জলিলিয়ার শুভ উদ্বোধন

স্থান : মা নীড়, ১৩২/৩, আহম্মদবাগ, রোড নং ২
সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪

তারিখ : ৮ ই এপ্রিল '১০, বৃহসপতিবার, বাদ মাগরিব

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, খানকায়ে জলিলিয়ার শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে সকল পীর ভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। সকলে খানকায়ে উপস্থিত হয়ে হুজুরের রুহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকি হাসিল করুন।

সালামান্তে-

মোহাম্মদ আবদুর রব

মোবাইল : ০১৭২০৯০৬৯৯৬

গাউসুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) ঃ জীবন ও কর্ম

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

হুযুর গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এমন সময়ে বাগদাদে গমন করেন যখন ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের পতনের যুগ আরম্ভ হয়। যদিও বাহ্যিকভাবে ইসলামী সাম্রাজ্য সুদুর স্পেন থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের ভেতরকার অবস্থা এমন দূর্বল হয়ে পড়েছিল যা ভাষায় পকাশ করার মত নয়। আল্লামা সুয়ূতী, শিবলী নুমানী, সৈয়দ সুলায়মান নদভী ও ইবনে যোওযী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সে যুগের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার সারমর্ম হলো এ যে, তখন মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিকসহ সর্বক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। এমন কি মুসলিম জগতের তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা দর্শনে ইমাম গায্যালী (৪৫২-৫০৫) এর মত মহান ব্যক্তিত্ব চরম মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটান। শেষ পর্যন্ত তিনি পরিব্রাজক দরবেশরূপে গোপনে বাগদাদ ত্যাগ করেন এবং নির্জনবাস অবলম্বন করেন। এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে হযরত আবদুল কাদের জীলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খোদা প্রদত্ত রূহানী ও ইলমী শক্তিবলে ইসলামের ডুবে যাওয়া তরীকে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়া থেকে উদ্ধার করেন। প্রিয নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম -এর সত্যিকার প্রতিনিধি দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে এবং জটিল ইসলামী তথ্য ও তাত্ত্বিক সমাধানকল্পে তিনি সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অমূল্য বাণীর সঠিক ব্যাখ্যা দানে ইসলামের আসল রূপ জনসম্মুখে তুলে ধরেন। তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের পরিধি, অকাট্যযুক্তি, ভাষার লালিত্য, বাগ্মিতা, গতিময় বাচনভঙ্গির মাধ্যমে অধঃপতিত মানব-সমাজকে তিনি ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। শুধু তাঁর বক্তব্য শুনার জন্য খলিফা-বাদাশা হতে আরম্ভ করে দরিদ্র শ্রেণী এমনকি ইয়াহুদী, নাসারা, কাফের মুশরিক প্রমুখ সমাজের সর্বস্তরের লোক ইসলামে সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিত। ইতিহাস পাঠে যে জিনিসটা আমাদেরকে হতবাক করে তুলে তা'হলো এ যে, হুযুর গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর জীবদ্দশায় ইসলামী বিশ্বে এমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ থেকে শুরু করে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকলে তাঁর আঙ্গুল হেলনে উঠতে আর বসতো। আব্বাসীয় সালতানাত ছিল নামেমাত্র সাম্রাজ্যের হর্তাকর্তা। মূলতঃ তখন বাগদাদের সকলে হুযুর গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুকেই নিজেদের সর্বেসর্বা বলে মনে করতো। শুধু তা'নয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকা-ই-কাদেরীয়া'র মাশায়েখগণ যুগে যুগে ইসলামের পূণর্জাগরণে যে অসামান্য ভূমিকা রাখেন তা কোন মুসলিম রাজা বাদশা রাখতে সক্ষম হননি। বলতে গেলে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যে সব মুসলমান অন্যায়-অবিচার তথা সমস্ত পাক পঙ্কিলতা থেকে বিরত থেকে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ভূমিকা পালন করছে তাদের পেছনে যে শক্তি কার্যকর করছে তা' হলো সত্যপন্থী তরীকাগুলোর শিক্ষা ও আদর্শ। খ্রিষ্টানদের ক্রুসেডের ফলে মুসলিমী সাম্রাজ্যে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, মুসলমানরা নিজেদের ঈমানী শক্তি ও জেহাদী প্রেরণা হারিয়ে বসেছিল তখন হুজযুর সৈয়্যদিনা গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর শিক্ষা প্রাপ্ত শিশ্যবৃন্দের ঈমানী শক্তি এবং জেহাদী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নুরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহ্ উদ্দীন আয়ুবীর মত দরবেশ বাদশা ইসলাম সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসেন। আর সে সময় ভারতবর্ষে গজনী শাসনের অবসানের পর ঘোরী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পেছনে যাঁর অসামান্য অবদান ছিল তিনি হুযুর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর নিকটতম আত্মীয় হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু। সিলসিলা-ই-কাদেরীয়া'র এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাক্রীয়া মূলতানী-যাঁর সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার বদৌলতে সিন্ধু ও ভারতবর্ষে ঈমান ও ইরফানের প্রদ্বীপ উজ্জ্বল হয়। আর বাংলার জমীনে এ সুহরাওয়ার্দি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শিহাব উদ্দীন ওমর সুহরাওয়ার্দির অন্যতম খলিফা হযরত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ইসলামের প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। এভাবে আমরা দেখি বিশ্বব্যাপী ইলামের প্রচার-প্রসারে যে সব হক তরীকা অংশগ্রহণ করেন সব তরীকার শায়খগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহ

তায়ালা আনহু-এর বেলায়তের ফয়য্ প্রাপ্ত। তাঁর শিক্ষা এ সিল্‌সিলার ঢক্কা বেলায়তের আকাশে সর্বদা বাজতে থাকবে। এ জন্য হুজুর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু নিজেই বলছেন-

আফালাত শুমূসুল আওয়্যালিনা ও শাম্‌সুনা
আবাদান আলাল উফুকিল উলা লা তাগরুবু

অর্থাৎ পূর্ববর্তী ওলীদের বেলায়েতের সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে। কিন্তু বেলায়তের আকাশে আমার সূর্য সর্বদা উদয়মান থাকবে।

হুযুর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকার বিশ্ব জনীন অবদানের কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত নবী প্রেমিক ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে লক্ষ্য করে বলেছেন-

রাজ কিস শহর মে করতে নেহী তেরে খেদাম
বাজ কিস নহর ছে লেতা নেহী দরিয়া তেরা।
মায্‌রায়ে চিশ্‌ত ও বুখারা ও ইরাক ও আজমীর
কওন ছে কাশ্‌ত পে বরসা নেহী ঝুলা তেরা।

অর্থাৎ বেলায়েতের রাজ্যে সকলে আপনার সেবক, আপনার বেলায়েতের সমুদ্র থেকেই সকল নদ-নদী উর্বরা। চিশ্‌ত, বুখারা, ইরাক ও আজমীরের বেলায়েতের উর্বর ভূমি এমন নেই যেখানে আপনার ফয়য্ বর্ষিত হয়নি।

এভাবে হুযুর গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু কাদেরিয়া তরীকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার-প্রসারে যেমন বিশ্বজনীন অবদান রাখেন তেমনি লেখনির মাধ্যমেও ইসলামের মর্মবাণীকে তুলে ধরেন অনাগত মানুষের জন্য। তাঁর রচিত 'শুনিয়াতুত তালেবীন' ফতহুল গায়্‌ব, ফতুহে রাব্বানী প্রভৃতি মুসলমানদের জ্ঞান ও চিন্তার বিকাশে মহান নিয়ামত। কাসীদা-ই গাউসিয়া তাঁর মুখ নিঃসৃত পঙতিমালায় তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির সর্বোচ্চ মকামের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পাশ্চাত্য লেখকগণ তাঁর প্রথমোক্ত গ্রন্থ 'শুনিয়াতুত তালেবীন' এর বর্ণনা শৈলীর প্রশংসা করেছেন। 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম' (১৯৬০ সালে প্রকাশিত) এর প্রবন্ধকার এ বলে মন্তব্য করেন- 'যে যুগে হযরত আবদুল কাদির জীলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আপন মিশনের কাজ সূচনা করেন তখন তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল গুনিয়াতু লিতালিবি তরীকিল হক' (প্রকাশকাল ১৩০৪ হিজরী, মিসর) এক বিশ্বজনীন দর্শন পেশ করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি একজন সুন্নী মুসলমানের চারিত্রিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধের চিত্র পেশ করেছেন। এতে হাম্বলী মতাদর্শের দৃষ্টিকোণে এমন এক জীবনাদর্শন সংকলন করেন যা জানা প্রত্যেক মুসলামনের কর্তব্য। এটাতে ৭৩ ফির্কারও বর্ণনা আছে। আর গ্রন্থটি 'তাসাওফ' এর রীতিনীতি বর্ণনার মাধ্যমে সমাপ্ত করেন।' (সূত্র, শাম্‌স বেরলভী গুনিয়াতুত তালেবীন-এর ভূমিকা থেকে)।

তাই বর্তমানে আমাদের সামগ্রিক জীবনে অবক্ষয়ের যে ধস নেমেছে এ অবস্থায় তাঁর বাণী ও আদর্শ অনুসরণ এবং তরীকা-ই-কাদেরীয়াসহ সকল হক তরীকায় অন্তর্ভূক্ত হবার মাধ্যমে আমরা যদি 'ইনসানে কামিল' হতে পারি তবে সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণ আমাদের জন্য সহজ হবে। হুযুর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর শিক্ষা ও আদর্শের ছোয়ায় যেমন তৎকালীন আত্মবিস্মৃত, দ্বিধাগ্রস্ত মুসলমানদের হৃদয়ে নব চেতনা ও প্রাণের সঞ্চার হয়েছিলো, তেমনি আমরা যেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকার শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যায় অবিচারমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে সহায়ক হবে এ দৃষ্টিকোণে এখানে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস রাখি।

জন্ম ও বংশ

হযরত গাউসল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা আলা আনহু হিজরী ৪৭১ সালে পবিত্র রমযান মাসে ইরানের অন্তর্গত 'জিলান' নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের অনেক পূর্বে বহু সংখ্যক আউলিয়া-ই-কিরাম তাঁর শুভ জন্ম সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে যান। তাঁর বংশীয় শাজ্‌রায় পিতার দিক হতে ইমাম হাসান আর মাতার দিক হতে হোসাইন রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর বংশধারার সাথে গিয়ে মিলিত হন। তাই তাঁকে 'নাজীবুত তারফাইন' বলা হয়ে থাকে। হুযূর গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জন্মগতভাবে আল্লাহর ওলী ছিলেন। পারিবারিক পরিবেশ ও আল্লাহ প্রদত্ত ও গুণের প্রভাবের দরুণ বালক সুলভ চঞ্চলতা তাঁর পবিত্র হৃদয়ে কখনই প্রবেশ করতে পারেনি। তিনি সম বয়স্ক বালক বালিকাদের সাথে খেলাধূলা ও হাস্য পরিহাসে কখনো লিপ্ত হননি। শৈশবকাল হতেই

চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁর সকল কাজকর্মে, হাবভাবে ও কথাবার্তায় কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেতো। এক অদৃশ্য শক্তির গোপন ইঙ্গিতেই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর পবিত্র জীবন গড়ে উঠেছিল। ফলে ছেলে মানুষী প্রেরণা কখনো তাঁর মনে জাগরূক হলে তিনি সুদূরের আহবান শুনতে পেতেন। কে যেন তাঁতে হাতছানি দিয়ে ডাকতো। গাউসে পাকের শিশু মনে এ প্রকার গায়বী বাণী খুব কার্যকর হয়েছিল। তিনি খেলাধূরায় মন না দিয়ে একমাত্রা আল্লাহর ইবাদতে দিবারাত্র অতিবাহিত করতেন।

অধ্যাপনা ঃ

ছাত্রজীবন ও সর্বপ্রকার রূহানী শিক্ষা সমাপ্ত করে হযরত গাউসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আবূ সাঈদ মাবারক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষকতার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার যশ-খ্যাতি অল্প সময়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হতে অগনিত শিক্ষার্থী তাঁর মাদরাসায় ভিড় করতে থাকে এবং বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে দ্বীনী বিষয়ক নানা প্রকার ফাতওয়া আসতে লাগলো। এভাবে তিনি প্রায় সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর শিক্ষকতা ও ফাতওয়া প্রদানের কাজ চালিয়ে যান। শরীয়ত বিষয়ক সকল মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে হযরত গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর এত গভীর ও পরিপক্ক জ্ঞান ছিল যে, ফাত্ওয়া পাঠ করে স্বল্প সময়ে বিনা চিন্তায় এর উত্তর লিখে দিতেন এবং আলিমগণ এ ফাতওয়া নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। আল্লামা শা'আবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, গাউছে পাক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর মাদরাসায় লোকেরা যোহরের নামাযের পূর্বে তাঁর থেকে তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ এবং কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন এবং যোহরের পর ইলমে ক্বিরাত শিক্ষা দিতেন।

জনগণের শিক্ষক ঃ

বাক্যে সংযম ছিল হযরত গাউসে আযম রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহুর চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হতে আগত শিক্ষার্থী ও জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দান ব্যতীত তিনি আর কিছুই বলতেন না। ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু বলতে তিনি অতিশয় সঙ্কোচবোধ করতেন আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি উপদেশ দিতেই বা যাবেন কেন? শৈশবকাল হতেই তো তিনি এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়ে আসছেন। এ স্থলেই বা এটার ব্যতিক্রম হবে কেন? পক্ষান্তরে বহু কষ্ট স্বীকার করে দূর-দূরান্ত হতে যারা তাঁর অমৃতবাণী শ্রবণের জন্য আগমন করতেন তাঁরা শুধু সওয়ালের জবাব শুনেই পরিতৃপ্ত হতে পারতেন না, আরও নসীহত শ্রবণের জন্য তাদের মন অধীর হয়ে থাকতো। এরূপে দিন কাটতে লাগলো। হযরত গাউসে পাকের নতুন পরিবেশ, নব কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলো। হিজরী ৫২১ সনের ১৬ই শাওয়াল রোজ মঙ্গলবার। হযরত গাউসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জাগ্রত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসালামকে তাঁর সম্মুখ দেখতে পেলেন। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসালাম তাঁকে সম্বোধন করে বললেন-'প্রিয় বৎস! তুমি জনসমুখ্যে বক্তৃতা প্রদান কর না কেন।' হযরত গাউসে আযম রাদিআল্লাহু আনহু আরয করলেন, 'নানাজান! আমি একজন অনারব (আযমী)। সুললিত ভাষায় বাকপটু আরববাসীর সম্মুখে আমি কিরূপে মুখ খুলতে পারি।' এটা শুনে হযরত রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসালাম বললেন, 'আচ্ছা, মুখ খোল। হযরত গাউসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মুখ খুললেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত সাতবার পাঠ করে তাঁর মুখে ফুঁক দিলেন। আয়াতটি এই-

উদ্‌য় ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিক্‌মাতি ওয়াল মাওয়িযাতিল হাসানাতি

অর্থাৎ 'হিকমতের সাথে এবং উত্তম নসীহত দ্বারা আল্লাহর পথের দিকে আহবান করো।' এবং বললেন এবার গিয়ে জনসাধারণকে সত্য ও ন্যায়ের দিকে আহবান করো।

এ আদেশ পেয়ে হযরত গাউসে আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু সেই দিনই যোহরের নামাযান্তে জনতার সম্মুখে বক্তৃতা দেয়ার জন্য মিম্বরে আরোহণ করলে তাঁর সম্মুখে হযরত আলী রাদি আল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখতে পেলেন। তিনিও মুখ খুলতে বললেন। মুখ খুললে ছয়বার তাঁর মুখে ফুঁক দিলেন। এরপর নিয়মিত বক্তব্য দেয়া আরম্ভ করলেন। তাঁর সূক্ষ্ম, তত্ত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যে শ্রোতাদের প্রাণ আকুল করে তুলতো এবং বহু চিরবিরহী চিত্ত আধ্যাত্মিক প্রেমের গুপ্ত

শান্তিধারায় বিলীন হওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠতো। কেহ কেহ প্রেমোচ্ছাসে অজ্ঞান হয়ে পড়তো, কেহ বিস্ময়াবিভূত হয়ে নিশ্চলভাবে বসে থাকতো, কেহ্ কেহ্ আবার অস্থির ও অবশ হয়ে পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করতে করতে বিলাপ করতে থাকতো। অনেকে আবার তাঁর বক্তব্যে প্রেমাস্পদের নূরের রশ্মি সহ্য করতে না পেরে শাহাদত বরণ করতো। সভা-ভঙ্গের পর জনতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মারিফতরূপ শরাব পানে প্রেমের বেদীতে এ নিহতদের সঠিক সংখ্যা নিরূপন করা হতো।

শাসকদের দূর্নীতি, আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা, ধর্মের প্রতি জনসাধারণের উদাসীনতা, মুতাযিলা ও বিদআতীদের ফিতনা, ফ্যাসাদ, একদিকে ধনীদের গগণচুম্বী মনোরম অট্টালিকা ও নানাবিধ বিচিত্র আয়েশ সামগ্রী, অপর দিকে অনাহারে অর্ধাহারে ক্লিষ্ট নিঃসহায় দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণকুঠির হযরত গাউসে আযমের কোমল প্রাণে অতি নিদারুণভাবে আঘাত করতো। তাঁর তেজোদীপ্ত এবং সংস্কারপন্থী সংকল্প এ সকল বিভেদ ও কুসংস্কারের ভিত্তিমূলে বারবার চরম আঘাত হানতে লাগলো। তাঁর স্পষ্টবাদিতার জন্য প্রথম প্রথম তাঁকে অসীম দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হতো। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাঁর অটল-অচল নির্ভরশীলতা এবং অপূর্ব সহিষ্ণুতা গুণে তিনি সকল প্রতিকূলতাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে সক্ষম হন।

হযরত গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর বক্তৃতায় সকল শ্রেণীর শ্রোতার মত পরিতৃপ্ত হতো। তাঁর সভামঞ্চে ফকির-দরবেশ, আমির-উমারা, রাজা-বাদশা, কুলী-মজুর, ধনী- নির্ধন, আলেম-ফাযেল, মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের বিপুল সমাগম হতো। লোক সমাগমের আধিক্যের দরুণ বিরাট ঈদগাহ ময়দানে তাঁর জন্য বক্তৃতা মঞ্চ তৈয়ার করা হয়। বিদেশাগত লোকের জন্য ঈদগাহের পার্শ্বে একটি মুসাফিরখানাও নির্মিত হয়। সকলেই তাঁর হিতোপদেশ শ্রবণ করে নিজ নিজ আত্মশুদ্ধির কার্যে তৎপর হতো। শত শত অমুসলিম ইয়াহুদী-খৃষ্টান-নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে পবিত্র ইলামের সুশীতল ছায়ায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যারা ইসলামের শাশ্বত রূপ ভুলে গিয়ে ধর্মকে প্রাণহীন আকারে পরিণত করেছিলেন, তারা ধর্মের প্রকৃত তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান লাভ করে জীবনের একমাত্র মহান আল্লাহর দরবারে পৌছতে পেরেছিলেন। মূলত হযরত গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু সকল প্রকার কুসংস্কার, অনাচার, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন।

হিজরী ৫২১ হতে ৫৬১ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর হযরত গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এইরূপ ওয়াজ-নসীহত এবং শিক্ষা-দীক্ষার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। চারশত অভিজ্ঞ আলেম সভাস্থলে তাঁর নসীহত লিপিবদ্ধ করতেন।

হযরত বড়পীর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু তিনদিন জনসমুক্ষে বক্তৃতা করতেন। শুক্রবার দিনের বেলায় ও শনিবার রাত্রে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এবং বুধবার ভোরবেলায় ঈদগাহ্ ময়দানে বক্তৃতা করতেন। মানুষসহ অগণিত জ্বিন এবং ফিরিশতারাও তাঁর সভায় আগমণ করতেন। নবীগণের আত্মিক উপস্থিতিতে তাঁর মজলিস সাফল্যমন্ডিত ও গৌরবান্বিত হয়ে উঠতো। জ্বীন, ফিরিশতা এবং নবীগণের আত্মিক উপস্থিতি ছাড়াও মানুষদের মধ্যে সাধারণ ষাট হতে সত্তর হাজার লোক সমবেত হতো। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেকেই স্পষ্টরূপে হযরত গাউসে আযম রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর বক্তৃতা শুনতে পেতো। বিশাল জনতার দরুণ নৈকট্য বা দূরত্বের কোন পার্থক্য থাকতো না। এটাও তাঁর কারামতসমূহের অন্যতম।

কথিত আছে যে, হযরত গাউসে আযম রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর এক পরম ভক্ত হযরত আদী ইবনে মুসাফির রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বাগদাদ হতে বহুদূরে অবস্থান করতেন। সুযোগ ও সময়ের অভাবে তিনি সব সময় হযরত গাউসে আযমের সভায় যোগদান করতে পারতেন না। কিন্তু দূর-দূরান্ত হতেও হযরতের উপদেশাবলী শ্রবণ করতে তার কোন অসুবিধা হতো না। যখন হযরত গাউসে পাক রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর সভা আরম্ভ হতো, তিনি স্বীয় বন্ধু-বান্ধব ও ভক্তগণসহ ঘর হতে বের হয়ে উঁচু পর্বতে আরোহন করতেন। তারপর তথায় তিনি হাতের লাঠি দিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করতেন এবং সবাইকে নিয়ে সেই বৃত্ত সীমানার ভিতরে উপবেশন করতেন। সেই স্থান হতে তাঁরা সকলেই হযরত গাউসে পাকের বক্তৃতা স্পষ্টরূপে শুনতে পেতেন এবং সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করতেন, তাঁদের লিপির সাথে হযরত আদী ইবনে মুসাফির রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর লিপি সম্পূর্ণরূপে মিলে যেতো।

স্বভাব চরিত্র ঃ

শিক্ষা-দীক্ষা এবং ধর্ম ও কর্ম জীবনের ইতিহাসে হযরত গাউসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর পূত-পবিত্র চরিত্রে যেরূপ অসীম আল্লাহ-প্রেম, বেহেশতী ইঙ্গিত, সুবিমল কর্ম প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর তাঁর স্বভাব চরিত্রের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো- যা আমাদের জীবনের জন্য শিক্ষার খোরাক হতে পারে।

হযরত গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর স্বভাব ছিল অত্যন্ত কোমল। তিনি ছিলেন খুব দয়ালু, উচ্চমনা এবং ক্ষমাশীল। তিনি কাউকে যে কথা দিতেন তা সর্বাবস্থায় রক্ষা করতেন। রাজা বাদশাগণ পর্যন্ত ভৃত্যের ন্যায় করজোড়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হতেন। অথচ তাঁর স্বভাব ছিলো যে, কনিষ্ঠদেরকে তিনি অপর সকলের চেয়ে অধিক স্নেহ করতেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতেন।

হযরত গাউসে আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত দানশীল এবং গরীব মিসকিনদের সবিশেষ যত্ন নিতেন। মেহমান ও বিশেষভাবে গরীব মিসকীনদের সাথে একত্রে বসে আহার করতেন এবং তাদের সাথে উঠাবসা করতেন। তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন। যেন মনে হতো তিনি তাদের অতি নিকটতম আত্মীয় ও নিতান্ত প্রিয়জন। তিনি তাদের কোন অন্যায় ধরতেন না এবং তাদের সদগুণের প্রশংসা করতেন।

হযরত গাউসে আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর পবিত্র চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত শায়খ মুয়াম্মা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- "হযরত গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর ন্যায় উন্নত চরিত্র, উদার চেতা, দয়ালু এবং অঙ্গীকার রক্ষাকারী ব্যক্তি আমি অপর কাউকে দেখিনি। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকার তাঁকে মোটেই অহংকারী করে তুলতে পারেনি। তিনি শিশুদের মত সহজ সরল এবং সুন্দর ও মনোরম ছিলেন। তাঁর অন্তর ছিল পুষ্পের ন্যায় কোমল, কিন্তু অন্যায়, অত্যাচার ও পাপের প্রতি তিনি ছিলেন বজ্রকঠোর। তিনি আগন্তকদেরকে সর্বাগ্রে সালাম দিতেন; তাঁর পূর্বে কেহ তাঁকে সালাম দিতে সমর্থ হতো না। বয়েজ্যেষ্ঠদেরকে তিনি যথোপযুক্ত সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। গরীব-মিসকীন এবং অলী দরবেশগণকে তিনি সমধিক গুরুত্ব দিতেন। তাঁর সুললিত বচন সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হতো এবং কারো হৃদয়ে আঘাত লাগে এমন বাক্য ব্যবহারে তিনি বিরত থাকতেন। কারো দোষ-ত্রুটি তাঁর কাছে গোচরীভূত হলে তাকে ভালরূপে বুঝিয়ে তা সংশোধন করে দিতেন। তাঁর অমূল্য উপদেশে সেই ব্যক্তি বিনয়ী হয়ে যেতো।

শরীয়ত ও তরীক্বতের শিক্ষাকার্যে সারাক্ষণ নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও হযরত গাউছে আযম রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু পারিবারিক কর্তব্য বিস্মৃত হননি। তাঁর সহধর্মিনীদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থেকে তাদের সেবা শুশ্রষা করতেন। তিনি সব সময় সাংসারিক খবরাদি নিতেন। স্বহস্তে গৃহের কার্যাদি করতেন, ঘরঝাড় দিতেন, পানি তুলতেন এবং দরকার হলে রান্নাও করতেন।

হযরত গাউসে আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর উনপঞ্চাশজন সন্তান-সন্ততি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে সাতাইশজন পুত্র বেং বাইশজন কন্যা। তিনি পুত্র-কন্যাদের ভরণ-পোশণ ও শিক্ষা দীক্ষার সুবন্দোবস্ত করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নি। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ পিতা।

হযরত গাউসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু- এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহ কেহ্ তাঁর জীবদ্দশাতেই পরলোকগমন করেন। কিন্তু পুত্র-কন্যার ইন্তিকাল কখনো তাঁকে পেরেশান করতে পারেনি। সংসারের সাধারণ কাজের ন্যায় নির্বিকার চিত্তে তিনি স্বহস্তে তাদের কাফন দাফনের কার্যও সমাধান করতেন এবং জানাযার নামাযও নিজেই পড়াতেন।

শত কাজের মধ্যে থেকেও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি হযরত গাউসে আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর নিষ্ঠা অটুট থাকতো। স্ত্রীর ভালবাসা, পুত্র-কন্যার স্নেহ, সংসারের মায়া তাঁকে কখনো আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। সকল কর্মের ভিতর থেকেও তিনি সর্বদা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ধ্যানে মশগুল থাকতেন।

শিক্ষা ও আদর্শ ঃ

হযরত গাউসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর শিক্ষা ও আদর্শের সারকথা এই যে, সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় অনুসারে শরীয়তের ইলম অর্জন এবং পুংখানুপুংখরূপে তদনুযায়ী আমল কর। তারপর আমলকে হালে পরিণত কর (আল্লাহ্ তাআলার সাথে ধর্মপথ-যাত্রীর সম্বন্ধ মযবুত হয়ে যাওয়ার পর সালিকের হৃদয়ে যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, এটাকে 'হাল' বলে) আর তোমার অবস্থা এভাবে গঠন কর যেন ইবাদতের মহব্বত দেহের প্রতিটি শিরা উপরিশরায় দৃঢ়ভাবে বসে যায় এবং তখন ইবাদত-কার্য পরিত্যাগ করা এমন কষ্টকর হয়ে উঠে, যেমন প্রাথমিক অবস্থা এটা সম্পাদনা করা কষ্টকর ছিল।

ধর্মপথে যার যাত্রা সবেমাত্র শুরু হয়েছে, আর যিনি কামালতের (সাধনা-সিদ্ধির) শেষ দরজায় উপনীত হয়েছে- এ উভয়ের জন্যই শরীয়তের অনুসরণ পূর্ণভাবে করা অবশ্য কর্তব্য বলে হযরত গাউসে আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু মনে করতেন। রেণু পরিমাণ বিদআত সংঘটিত হতে দেখলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হতেন এবং বলতেন, 'তোমরা গাওস, কুতুব, অলী আব্দাল যাই হও না কেন, খুব ভালরূপে মনে রাখিও যে, বাতিনী রাজ্যের বিভিন্ন পদে যারা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁদের সকলের একচ্ছত্র সরদার হলেন নবী-সম্রাট হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাঁদের মধ্যে যে ব্যক্তি যে পদ এবং যে পুরস্কার পেয়ে থাকেন, এটা কেবল রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বদৌলতেই পেয়ে থাকেন। অতএব জেনে রাখ, যে ব্যক্তি সুন্নাতের গন্ডি হতে ইঞ্চি পরিমাণ এ দিক সেদিক হবে, তার পক্ষে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা অবান্তর। আর যে তরীকতের সাথে শরীয়তের একটি আদেশেরও বিরোধ থাকে এমন তরীকত অনুসরণ করে চললে সিদ্দীক (অকপট পরম ধার্মিক) না হয়ে বরং যিন্দীক (বেঈমান) হতে হয়।

অতএব যে সকল জাহিল ভন্ড-পীর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করে, দরবেশি পোশাক পরিধানপূর্বক ঘাড় নত করে নিজেকে বিনয় ও আল্লাহর ধ্যানে লিপ্ত বলে পরিচয় দেয়, বড় বড় দানার লম্বা তস্বীহ তাড়াতাড়ি টানতে থাকে বা আহার ও পোশাক পরিচ্ছেদে পরহেযগারী দেখিয়া দুনিয়া অর্জনের ফন্দি এঁটে রয়েছে, মেকি হয়ে খাঁটি বুযর্গগণের ভান্ ধরেছে এবং শরীয়ত ও তরীকতকে পরস্পরবিরোধী ভিন্ন ভিন্ন পথ বাতলিয়ে মানুষকে সুন্নাতের অনুসরণ হতে বিরত থাকার চেষ্টায় তৎপর রয়েছে, তাদের হতে বেঁচে থাকার জন্য হযরত গাউসে আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু জোর তাকীদ করে গেছেন।

গাউসে পাকের দশটি উপদেশ ঃ

হযরত গাউসে আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু ধর্ম পথযাত্রীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন-

প্রথম ঃ আল্লাহর পবিত্র নাম নিয়ে শপথ করে না। সাবধান, তোমার রসনা হতে যেন "আল্লাহর শপথ" এই শব্দ কখনও বের না হয়। তুমি যদি এ উপদেশ অনুযায়ী তোমার অভ্যাস গঠন করে নিতে পার, তার আল্লাহর জ্যোতিপুঞ্জের একটি দ্বার তোমার হৃদয়ে খুলে দেয়া হবে। এতে তুমি উচ্চ মর্যাদা পাবে এবং এ ইচ্ছা স্থায়ী হবে।

দ্বিতীয় ঃ মিথ্যা হতে বেঁচে থাক; এমন কি হাসি-ঠাট্টা করেও মিথ্যা বলো না। সত্য বলার এ অভ্যাস করে নিতে পারলে আল্লাহ্ তোমাকে অন্তর্দৃষ্টি এবং ইলম দান করবেন।

তৃতীয়ত ঃ প্রতিজ্ঞা পালন কর, তা হলে তোমাকে হায়া (লজ্জাশীলতা) ও সাখাওয়াতের (বদান্যতার) মরতবা প্রদান করা হবে।

চতুর্থ ঃ কাউকে অভিশাপ দিও না; এটাই পূণ্যবান ও সিদ্দীকিগণের তরীকা। তা হলে আল্লাহ্ তোমার সম্মান অটুট রাখবেন এবং তোমাকে অপরের অনিষ্ট হতে নিরাপদে রাখবেন।

পঞ্চম ঃ কারো জন্য বদদোয়া করো না বরং ধৈর্যের সাথে তোমার উপর সকল অবিচার-অত্যাচার সহ্য কর। তা হলে লোকে তোমাকে ভালবাসবে এবং তুমি সকলের ভক্তিভাজন হবে।

ষষ্ঠ ঃ কোন মুসলমানকে সঠিকভাবে মুশরিক, কাফির বা মুনাফিক বলো না। এটাই সুন্নাত তরীকা। কে মুশরিক, কে কাফির বা মুনাফিক তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই

জানেন। কাকেও এরূপ শব্দে অভিহিত না করলেই আল্লাহর ইলমে অনধিকার চর্চা হতে বেঁচে থাকতে পারবে এবং তার রহমত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে।

সপ্তম ঃ জাহিরী (প্রকাশ্য) ও বাতেনী (অপ্রকাশ্য) সকল প্রকার গুনাহ্ পরিত্যাগ কর এবং নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও এগুলো হতে বাঁচাও। তা হলে অতি শীঘ্রই তোমার হৃদয়ে এর সুফল দেখতে পাবে।

অষ্টম ঃ তোমার জীবিকা নির্বাহের ভার অপরের উপর অর্পন করো না। তা হলে তোমার দ্বারা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে প্রতিরোধের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারবে এবং এতেই চূড়ান্ত সম্মান রয়েছে; আর এতেই আল্লাহ্ তাআলার উপর তোমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও নির্ভরশীলতা পূর্ণ হলো কিনা বুঝা যাবে।

নবম ঃ লোকের নিকট সামান্যতম আশা রাখিও না। এতেই সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাওয়াক্কুল নিহিত রয়েছে। এটার দ্বারাই যুহ্দ ও অরা (নিরর্থক কাজ ও কথা হতে বিরত থাকাকে 'অরা' বলে) হাসিল করতে পারবে।

দশম ঃ বিনয় ও শিষ্টাচারে অভ্যস্ত হও; সকল ইবাদত এতে গিয়ে শামিল হয়। এতেই রয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান এবং পূর্ণ পরহেযগারী। আর এ স্বভাব দ্বারাই সৎ লোকদের দলভুক্ত হওয়া চলে।

শরীয়তের ইল্‌ম ঃ

আজকাল কতিপয় মুর্খ ভণ্ড-পীর শরীয়তের ইলম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা শরীয়তের বিধি-নিষেধও মেনে চলে না। বরং শরীয়তের প্রকাশ্য বিরোধীতা করে বলে যে, শরীয়ত ও তরীক্বত দুটি ভিন্ন জিনিস। মূলত তারা তরীক্বত সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। দুনিয়ার লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে শয়তানী বেড়াজাল বিস্তার করতে তারা সরলপ্রাণ জনসাধারণকে গোমরাহ্ করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু জগতের বড় পীর, সূফীকুল শিরোমণি, পীরানে পীর দস্তগীর, মাহবুবে সোহহানী, কুতবে রাব্বানী, গাউসে আযম হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ মহীউদ্দীন আবদুল কাদের জীলানী রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু সর্বপ্রথমে শরীয়তের ইলম অর্জন করে তদনুযায়ী আমল ও আখলাক দুরস্ত করে তারপর আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অতিরিক্ত যিকর আযকারে মনোনিবেশ হতে দুনিয়াবাসীকে উপদেশ দেন। তিনি বলেন– "সর্বাগ্রে ইলম অর্জন কর এবং তারপর নির্জনতা অবলম্বন কর। কারণ, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন না করে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হয়, সাধারণত এমন ব্যক্তি সফলতা অর্জন করেছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। অধিকাংশ স্থলেই এরূপ লোকের ইবাদত বরবাদ হয়ে যায়। তাই সর্বপ্রথমে শরীয়তের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত কর এবং তারপর আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত যিকর-আযকারের প্রতি মনোনিবেশ কর। যে ব্যক্তি স্বীয় অর্জিত ইলম অনুযায়ী তাকে বিনা উস্তাদে, বিনা কিতাবে নিজ হতে ইলম দান করেন।

রওযায়ে আকদাসে হযরত গাউসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

আল্লামা আবদুল কাদের আরবুলী কৃত 'তাফরীহুল খাতির ফী মানাক্বিবিশ, শায়খি আবদালির কাদির' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একদা হুজুর সায়্যিদুনা হযরত গাউসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মদিনা মুনাওয়ারায় প্রিয় রাসূলের রাওযা আকদাসের পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দু'টি কবিতা আবৃত্তি পূর্বক প্রিয় রাসূলের দিদার লাভের আকূতি প্রকাশ করলেন যে–

'ফী হালাতিল বু'দি রুহী কুন্‌তু উরসিলুহা
তুকাব্বিলুল আরদা আন্নী ওয়া হিয়া নায়িবাতী।
ওয়া হাযি-হি নূবাতুল আশ্‌বাহি ক্বাদ্ হাদারতু
ফামদুদ ইয়ামীনাকা কায় তাহ্‌যা বিহা শাফাতী।

কাব্যানুবাদ ঃ

'যখন দূরে থাকতাম আমি পাঠিয়ে দিতাম এ হৃদয়
আমার হয়ে চুমতো সে এ চরম ধূলি সেই সময়।
এখন আমি স্বয়ং এসে, তোমার দ্বারে এই হাজির
করকমলে চুমবে এ ঠোঁট নসীব যেন বুলন্দ হয়।'

(হাফেজ আনিসুজজামান অনুদিত)

অর্থাৎ 'হে রাসূল! দূরে অবস্থানকালে স্বীয় রূহকে রওযা আক্‌দাসে পাঠিয়ে দিতাম, যেন আমার পক্ষ হয়ে আপনার কদমবুসী করে যায়। এখন তো আমি সশরীরে আপনার মহান দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং (দয়া করে) আপনার হাত মোবারক বাড়িয়ে দিন যেন আমার ওষ্ঠ তা চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করে।

এ কবিতা পাঠমাত্র রওযা শরীফ হতে নবীজীর হাত মোবারক বের হয়ে আসে এবং গাউসে পাক রাদিআল্লাহ

তাআলা আনহু মুসাফাহা ও চুম্বন করলেন এবং নিজ মাথা মোবারকে রাখলেন।

উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে বিখ্যাত ওলী শায়খ সায়্যিদ আহমদ কবির রেফাঈ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও রওযা আকদাসে যিয়ারত করতে গেলে তিনিও গাউসে পাকের অনুসরণ করতে গিয়ে উক্ত কবিতা পাঠ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর দিদার লাভের প্রত্যাশা করলে তিনিও ঐ বিরল সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন। ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত 'তানভীরুল মালাক্ বি রুয়াতিন নবী ওয়াল মালাক্' গ্রন্থে এ ঘটনা বিধৃত করেন। তাছাড়া শায়খ আহমদ কবির রেফাঈ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর প্রায় সকল চরিতকার তাঁর কারামত বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা করেছেন। যাতে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই।

(সূত্র, (১) আল-বুরহানুল মুশায়্যাদ, কৃত শায়খ আহমদ কবীর আল্ হোসাইনী (রাঃ), আনুবাদ-আবুদল খালেক, প্রকাশক-ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে-১৯৮৬, পৃষ্ঠা ১৪-১৫। (২) আল বুরহানুল মুআইয়্যাদ, কৃত শাহ আহমদ কবীর রেফায়ী (রাঃ), অনুবাদ- মাওঃ মাহমুদুল হাসান, মযলিসে ইলমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-জ)।

রচনাবলী ঃ

আধ্যাত্মিক সাধনা, অধ্যাপনা, ওয়ায-নসীহত, ফাত্ওয়া প্রদান ইত্যাদি কার্য সমাধানের পর হুযুর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু যে সময়টুকু পেতেন তাও তিনি আরাম-আয়াশে ব্যয় করতেন না। এ সময়টুকু তিনি গ্রন্থাবলী রচনায় অতিবাহিত করতেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো প্রসিদ্ধ লাভ করে।

১। 'ফুতুহুল গাযব'- হযরত গাউসে পাক আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর বিভিন্ন সময়ে গঠিত আটাত্তরখানা বক্তৃতা এ গ্রন্থে স্থান পায়। সূফীতত্ত্ব ও মারিফাতের উপদেশপূর্ণ এ মূল্যবান গ্রন্থটা তরীক্বতপন্থীদের জন্য একটি অমূল্য রত্ন।

২। 'আল-ফাত্হুর রাব্বানী'-এটাতেও হযরত গাউসে পাক আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর ওয়ায ও মালফুযাত (অমীয়বাণী) সংকলন করা হয়। তাঁর পৌত্র সায়্যিদ আফিফ উদ্দীন মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এটা সংকলন করেন। যা হযরত আবদুর রায্যাক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু ও অন্যান্য চার'শ বিখ্যাত আলেমবৃন্দ বিভিন্ন সময় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

৩। 'ওনিয়্যাতুত্তালিবীন'-এ গ্রন্থে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি বিষয়ে মাস্আলা মাসায়েলের উপর হাম্বলী মাযহাবের এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। হাম্বলী মায্হাবের ফিক্বহী মাসায়েল ছাড়াও এতে ধর্মতত্ত্ব (আকাঈদ) ও তাসাউফের উপরও সবিশেষ আলোচনা করা হয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত-এর মত ও পথ কি, অকাট্য দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা দেখিয়ে দেয়া হয় এবং বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্ত মতের খন্ডন করা হয়। এ ছাড়া তরীক্বতপন্থীদের দৈনন্দিন আচার-অভ্যাস, যেমন যিকর-আয্কার, পীর ও মুরীদের আদব, বান্দার হক ইত্যাদিও এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। আসলে এ গ্রন্থটাকে শরীয়ত ও তরীক্বতের সারাংশ বললে অত্যুক্তি হয় না।

৪। 'সিররুল আসরার ফীমা ইলায়হিল আব্রার' (তাসাউফ বিষয়ক গ্রন্থ)।

৫। 'রিসালায়ে গাউসে আযম'-এ পুস্তকটা সুফী সায়্যিদ নাসীর উদ্দীন হাশেমী কাদেরী রিযভী বরকাতী কৃত 'মাযহারে জামালে মোস্তাফায়ী' গ্রন্থে উর্দূ অনুবাদসহ পাকিস্তান ও ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।

৬। 'কাসায়েদে শরীফা'-আরবী কাসিদার সংকলন।

৭। 'দিওয়ানে গাউসে আ'যম'-ফার্সী কবিতার সংকলন।

৮। উপরোক্ত রচনাবলী ছাড়াও তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'সালাতুল কুবরা' দরূদে এক্সিরে আ'যম, 'দরূদে কিব্রিয়াতে আহ্মার' ও 'উসবূউ শরীফ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এগুলো হুযুর হযরত গাউসে পাক আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু দৈনন্দিন অযিফা হিসেবে পাঠ করতেন।

ইনতিকাল ঃ

হিজরী ৫৬১ সালের রবিউস্সানী শুরুতেই হযরত গাউসে পাক আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিন দিন তাঁর পীড়া বৃদ্ধি পেতে দেখে তাঁর বুঝতে দেরী হয়নি যে, তাঁর মহাপ্রয়ানের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

হযরত আবদুল ওয়াহ্হাব রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হুযূর হযরত গাউসে পাক আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর যখন ওফাত লাভের সময় একেবারে ঘনিয়ে আসলো, তখন লোকেরা তাঁর কাছে অন্তিম উপদেশের জন্য আরয করলে তিনি দুনিয়াবাসীদের জন্য যে অন্তিম বাণী রেখে গেলেন তা এ যে, 'একমাত্র আল্লাহকে ভয় কর এবং কেবল তাঁরই ইবাদত কর। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা না। কারো কাছে কোন আশা কর না। আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো উপর ভরসা করো না। একমাত্র তাওহীদ ব্যতীত কোন কিছুর উপরই বিশ্বাস করো না। তাওহীদ সম্বন্ধে সকলেই একমত।'

অতঃপর হযরত গাউসে পাক আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন- 'আমি নির্ভয় হয়েছি। কোন কিছুকে এবং মালাকুল মাওতাকেও আমি পরওয়া করি না।

১১ রবিউস্‌সানী ইশার নামাযান্তে তিনি আল্লাহর তাআলার দরবারে দীর্ঘ মুনাজাত করলেন। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এবং তাঁর আওলাদগণকে লক্ষ্য করে বললেন- আমার চতুষ্পার্শ হতে তোমরা দূরে সরে থাক। আমি প্রকাশ্যভাবে তোমাদের সাথে থাকলেও তোমাদের ও সকল মাখলুকের এবং আমার মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে। তিনি আরো বলেন, তোমরা ছাড়াও (আমার অন্তিম শয্যায়) অপরাপর ব্যক্তিও আগমন করেছেন (যাঁদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছো না) অতএব তাঁদেরকে স্থান করে দাও, তাঁদের স্থান প্রশস্ত কর এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। এখানে খুব বড় রহমত রয়েছে, তাঁদের স্থান সংকোচিত করো না।

অতঃপর তাঁর পবিত্র মুখ হতে তিনবার আল্লাহু শব্দ নিঃসৃত হবার সাথে সাথে তিনি আপন মাওলায়ে হাক্বীক্বী (প্রকৃত বন্ধু) এর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন।

সুযোগ্য উত্তরসূরী ঃ

হযরত গাউসে পাক আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর চারজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁর চল্লিশ বছর বিবাহিত জীবনে তিনি ৪৯ জন সন্তান-সন্ততি লাভ করেন। তাদের মধ্যে ২৭ জন ছিলেম পুত্র, আর ২২ জন কন্যা।

হযরত গাউসে পাক আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর সন্তান সন্ততিগণ সকলেই বিদ্বান ও বুযর্গ ছিলেন এবং সাধনা ক্ষেত্রেও তাঁরা শীর্ষস্থান লাভ করেন। মহান পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা সকলে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন। দুনিয়ার সকল দেশ হতে বহু লোক হাদীস, তাফসীর, ফিক্বাহ প্রভৃতি ইসলামী শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য তাঁদের কাছে আগমন করতেন। হযরত গাউসে পাক আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর পুত্রদের মধ্যে যাঁরা প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শায়খ আবদুল ওহ্হাব, শায়খ ঈসা, শায়খ আবু বকর, অবদুল আযীয, শায়খ আবদুল জব্বার, শায়খ আবদুর রাজ্জাক, শায়ক ইবরাহীম, শায়খ মুহাম্মদ, শায়খ আবদুল্লাহ্, শায়খ আবূ নসর মূসা, শায়খ ইয়াহইয়া (রিদ্‌ওয়ানুল্লাহি তাআলা আলায়হিম আজমাইন)। তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পাঠ করুন- শায়খ্ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী কৃত 'যুবদাতুল আসর এবং আল্লামা নূরউদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন ইউসুফ শানতুফী কৃত 'বাহ্জাতুল আস্‌রার' প্রভৃতি গ্রন্থ।

হুযুর গাউসে আযম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু উসিলায় আল্লাহ আমাদেরকে উভয় জগতের কামিয়াবী ও সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

বাংলাদেশ যুবসেনায় যোগ দিন

যোগাযোগ ঃ

মোহাম্মদ ফারিজুল বারী
০১৯২১৩০৮০৫৯
মোহাম্মদ বিদ্যুৎ
০১৭১৩৪৩১২৪২
মোহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
০১৭১৬৫৭৩৩৩৩

আল্লাহ ওয়ালাদের নামাযের দৃষ্টান্ত

-হযরত বড়পীর (রহঃ)

এইরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে সিরীন (রহঃ) যখন নামায পড়িতে দণ্ডায়মান হইতেন, আল্লাহর ভয়ে তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত।

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রাহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন আল্লাহর ভয়ে লোকের কথাবার্তা তাঁহার কর্ণগোচর হইত না।

হযরত সাআদ ইবনে মাআয বলেন, আমি এমন কোন নামায পড়ি নাই, যাহার মধ্যে আমি কোনরূপ পার্থিব চিন্তা করিয়াছি।

মুজাহিদ বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তাঁহাকে এক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের মত মনে হইত। অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে তিনি - একেবারে অনুভূতিহীন নিশ্চল জড় পদার্থের মত হইয়া যাইতেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া লোকের ধারণা হইত-তিনি সম্ভবতঃ চোখের সামনে দোজখের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিতেছেন।

গোলাম আতাবাহ (রাহঃ) যখন তীব্র শীতের মৌসুমে নামাযে দাণ্ডায়মান হইতেন, তখন তাঁহার সমস্ত শরীর বহিয়া দরদর বেগে ঘর্ম নির্গত হইতে থাকিত। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিতেন, আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে আমার লজ্জা এবং ভয় উপস্থিত হয়, তাই এইভাবে শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া যায়।

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) একবার যে গৃহে নামায পড়িতেছিলেন, ঘটনাক্রমে হঠাৎ সেই গৃহে আগুন লাগিয়া গেল। বসরা শহরের সব লোক দৌড়াইয়া আগুন নিভাইতে আসিল এবং শোরগোল করিয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই দুর্যোগ এবং এতলোক সমাগম ও তাহাদের কিছুই শোরগোল মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ)-টের পাইলেন না। তিনি পরম একাগ্রতার সাথে নামাযেই মগ্ন রহিলেন। নামায শেষ হইবার পর তিনি জানিতে পারিলেন যে, গৃহে আগুন লাগিয়াছিল এবং লোকজন তাহা নিভাইয়া ফেলিয়াছে।

এইরূপ বর্ণিত আছে যে, আর একবার তিনি জামে মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন, এমন সময় ছাদের একটি ভারী বর্গা ছুটিয়া গিয়া তাঁহার একেবারে পার্শ্বে পতিত হইল। উপস্থিত লোকগণ চিৎকার শুরব করিয়া দিল, কিন্তু তিনি এইসব কিছুই জানিতে পারিলেন না। আম্মার ইবনে জোবায়েদ বলেন, একবার তিনি জুতা সামনে রাখিয়া নামায পড়িতেছিলেন। জুতার তলাটি নূতন ছিল। উহার দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। নামায শেষ করিয়াই তিনি জুতা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইহার পর আর কখনও তিনি জুতা পরিধান করেন নাই।

রাবিআ ইবেন খোশাইম একবার নামায পড়িতেছিলেন। তাঁহার সামনে বিশ হাজার দেরহাম মূল্যের একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। চোর তাহার সম্মুখ হইতে ঘোড়াটিকে রশি খুলিয়া লইয়া গেল। সকাল বেলা লোকজণ জানিতে পারিল যে, তাঁহার ঘোড়াটি চুরি হইয়াছে। অতএব অনেকেই তাঁহার সামনে দুঃখ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি সকলকে বলিলেন, ঘোড়াটি আমার সম্মুখ হইতেই অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু আমি যেকাজে লিপ্ত ছিলাম, ঘোড়া রক্ষা করা হইতে তা অধিক গুরবত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান ছিল। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে অল্পক্ষণের মধ্যেই উক্ত চোর ঘোড়াটি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।

সংগ্রহঃ-মানিক মোখতারী, নওদা, রাজশাহী।
গুনিয়াতুত ত্বালিবীন হইতে।

উজ্জীবন লাইব্রেরী

দেশ-বিদেশের সুন্নী লেখকদের কিতাব, বই, পুস্তক, মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই, মাসিক তরজুমান, সুন্নীবার্তা সহ প্রখ্যাত বক্তা ও নাত শিল্পীদের অডিও ক্যাসেট, ভিডিও সিডি ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সার্বিক যোগাযোগ ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

মোহাম্মদপুর, কাদেরীয়া মাদ্রাসার উত্তর পার্শে,

ঢাকা, মোবাইলঃ ০১৮১৫৪১০২৬২

হুজুর গাউসে পাকের কতিপয় কারামত

হযরত শাইখ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)

১। মুহিউদ্দীন নামকরণ হওয়ার কারণ

কাদেরীয়া সিলসিলার মাশায়েখে কিরাম বর্ণনা করেন- লোকেরা গাউছে পাকের কাছে "মুহিউদ্দীন' নামের মাহাত্ম্য জানতে চাইলে, তিনি বলেন, আমি একবার এক দীর্ঘ সফর শেষ করে বাগদাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। আমার পায়ে কোন জুতা ছিল না। পথে এক অসুস্থ লোকের দেখা হলো, যার চেয়ারা চিল ফ্যাকাশে এবং শরীর ছিল শীর্ণকায়। সে আমাকে সালাম করলো, আমি 'ওয়ালাইকুম সালাম' বললাম। সে আমাকে ওর কাছে ডাকলো। আমি কাছে গেলে সে বললো-আমাকে উঠাও। আমি ওকে উঠিয়ে বসালাম। তখন ওর শরীরটা ভাল দেখাচ্ছিল এবং চেহারাওটাও উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো-তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি 'না বললাম। তখন সে বললো-আমি তোমাদের ধর্ম। আমি জীর্ণ-শীর্ণ ও দূর্বল হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা আমাকে নবজীবন দান করেছেন। আজ থেকে তোমার নাম হবে 'মুহিউদ্দীন'। যখন আমি জামে মসজিদের দিকে ফিরে আসলাম, তখন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো এবং সে আমাকে 'হে সৈয়দ মহিউদ্দীন' বলে সম্বোধন করলো। নামায আদায় করার পর দেখলাম লোকেরা আদব সহকারে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং আমার হাতে চুমু দিতে লাগলো আর মুখে 'ইয়া সৈয়দ মুহিউদ্দীন' বলতে লাগলো, অথচ ইতোপূর্বে কেউ আমাকে এ নামে সম্বোধন করেনি।

২। গাউছে পাকের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া

শায়খ আরিফ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবুল ফাতাহ আল-হারুরী বর্ণনা করেন-আমি পূর্ণ চল্লিশ বছর গাউছে পাকের খেদমতে ছিলাম। এ সুদীর্ঘ সময়ে আমি তাঁকে এশার নামাযের অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করতে দেখেছি। তৎকালীন বাদগাদের বাদশাহ তাঁর সাথে দেখা করার জন্য কয়েকবার রাত্রে এসেছিলেন। কিন্তু ইবাদতে মগ্নতার কারণে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি। আমি কয়েক রাত তাঁর সঙ্গে অবস্থান করে দেখেছি যে, তিনি রাতের প্রথম ভাগে নামায সংক্ষেপে পড়ে যিকিরে নিয়োজিত হতেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হতো তিনি বলতেন-

اَلْمُحِيْطُ الْعَالِمُ الرَّبُّ الشَّهِيْدُ الْحَسِيْبُ الضَّالُ وَالْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ۔

এরপর দেখলাম, তাঁর শরীর দুবল হয়ে যেত। কোন কোন সময় তাঁর শরীর খুবই ছোট হয়ে যেত, আবার কোন কোন সময় অনেক বড় দেখাতো। কোন সময় তাঁর শরীর বাতাসে উড়তো এবং অদৃশ্য হয়ে যেত। আবার কোন সময় নামায পড়তে দেখা যেত। তাঁর অদৃশ্য হওয়ার সময়টা ছিল রাতের তৃতীয়াংশ ভাগের শেষাংশে। তিনি নামায পড়ার সময় সিজদা দীর্ঘ করতেন এবং স্বীয় মুখ মাটির সাথে লাগাতেন। অতঃপর বসে মুরাকাবা করতেন। তখন তাঁর শরীর উজ্জ্বল আলোক রশ্মিতে এমন ভাব ঢেকে যেত যে তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেন এবং সেই নূরানী আলোকরশ্মির দিকে তাকানো যেত না। মাঝে মধ্যে আমি 'সালাম' শব্দ শুনতাম এবং তিনি 'ওয়ালাইকুম সালাম' বলতেন। এ ভাবে রাত অতিবাহিত করে তিনি ফজরের নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন।

৩। বাগদাদ থেকে শোস্তর শহর গমন ঃ

শারখ আবুল কাসেম ওমর বিন মছউদ বজ্জাজ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন-আমি হযরত সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি "প্রথমাবস্থায় আমি যে সব আধ্যাত্মিক অবস্থার সম্মুখীন হতাম, ওগুলো বুঝার জন্য খুবই তাড়াহুড়া করতাম কিন্তু এ সবের পরিণতি সম্পর্কে জানতান না। যখন পর্দা অপসারিত হয়ে গেল, তখন এ সব অবস্থানাদি আমার কাছে সহজ হয়ে গেল। একবার আমাকে অনেক দূরের এক জায়গায় যাবার কথা ছিল। আমি বাগদাদের একটি বিরান ভূমিতে ছিলাম। কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে আমি শোস্তর শহরে পৌছে গেলাম। অথচ বাগদাদ থেকে এর দুরত্ব ছিল বার দিনের পথ। আমি এ অঘটনের জন্য যখনই চিন্তাযুক্ত হলাম, তখন আমার

সামনে এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। তিনি বলছিল, এ ঘটনা তোমার কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে অথচ তুমি হলে শায়খ আবদুর কাদের।

৪। ওয়াজের মজলিসে সাপ

একবার তাঁর মসলিসে দেশের প্রসিদ্ধ ফকিহ ও বিশিষ্ট আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি অদৃষ্টের মাস্আলা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ ছাঁদ থেকে একটি বড় সাপ মজলিসে পতিত হলে, উপস্থিত সবাই ভয়ে পালিয়ে গেল কিন্তু গাউছে পাক বসে রইলেন। সাপ তাঁর কাপড়ের ভিতর ঢুকে শরীরের চারি দিকে চক্কর দিয়ে কাপড়ের কলারের দিক দিয়ে বের হেয় তাঁর গলায় বেড় দিল। এরপরও তিনি তাঁর আলোচনা বন্ধ করলেন না এবং স্বীয় জায়গা থেকে নড়লেন না। অতঃপর সাপ তাঁকে ছেড়ে মাটিতে নেমে আসলো এবং লেজের উপর দাঁড়িয়ে এমনভাবে কথা বললো, যা আমরা কখনো শুনিনি। তারপর সাপ বের হেয়ে গেল। লোকেরা ফিরে আসলে তিনি বললেন, সাপ আমাকে বলেছে যে, সে এ ভাবে অনেক ওলীকে পরীক্ষা করেছে কিন্তু আমার মত কাউকে অটল পায়নি। আমি সাপকে বলেছি যে, তুমি আমার উপর ঐ সময় পতিত হয়েছ যখন আমি অদৃষ্ট নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তুমি একটি নগন্য পোকা থেকে অধিক ক্ষমতা রেখ না, যাতে অদৃষ্ট পরিচালিত করে। আমি মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম যে আমার কাজ যেন আমার কথার ব্যতিক্রম না হয়।

হুজুর গাউছে পাক বলেন, ওয়াজে প্রাথমিক অবস্থায় সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজের বারনটাই আমার ওয়াজে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মাঝে মধ্যে আমার মনে এত কথা জমা হয়ে যেত, যার ফলে নিশ্চুপ থাকাটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। প্রথম প্রথম দু'তিন জন আমার বক্তব্য শুনতো। পরবর্তীতে মানুষ বাড়তে লাগলো। অল্পদিনের মধ্যে মানুষের ঢল পড়ে গেল। এমন এক সময় আসলো খলীফার শাহী দরজার সামনে জায়নামায বিছায়ে ওয়াজ করতে লাগলাম। সেখানেও স্থান সংকুলান হলো না। শেষ পর্যন্ত শহরের বাইরে এক বিরাট ময়দানে মিম্বর স্থাপন করা হলো। লোকেরা গাধা, ঘোড়া ও উটে আরোহন করে দূরদূরান্ত থেকে আমার ওয়াজ শুনার জন্য আসতো এবং একাগ্রচিত্তে ওয়াজ শুনতো। কোন কোন সময় প্রায় সত্তর হাজারের লোক জমায়েত হতো।

৫। বায়তুল মুকাদ্দস থেকে এক কদমে বাগদাদ

শায়খ ছদকা বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন- একবার গাউছে পাকের মজলিসে লোকেরা তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ও ওয়াজ শুনার অধীর আগ্রহে বসে রইলো। কিছুক্ষণ পর গাউছে পাক তশরীক আনলেন এবং মিম্বরে গিয়ে বসলেন। তখনও তিনি কোন কথা বলেননি এবং কোন ক্বারীকে কেরাত পড়ার নির্দেশ দেননি। কিন্তু সেই নিরব অবস্থায় লোকদের মধ্যে অজদ এসে গেল। আমি মনে মনে বললাম যে শায়খ তো এখনও কোন কথা বলেন নি এবং কোন ক্বারী কুরআন তেলাওয়াতও করেনি কিন্তু এ অজদ ও উচ্ছাস কি ভাবে সৃষ্টি হয়ে গেল? শায়খ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা, আমার এক মুরিদ বায়তুল মুকাদ্দস থেকে এক কদমে বাগদাদে এসেছে। সে আমার হাতে তওবা করেছে। সে আজকের মসলিসের সবাইকে দাওয়াত করেছে। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম- যে ব্যক্তি এক কদমে বায়তুল মুকাদ্দেস থেকে বাগদাদ আসতে পারে, তার কোন্ বিষয়ে তওবার প্রয়োজন? তিনি পুনরায় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে ঐ বিষয়ে তওবা করে যে সেতো কদম উঠিয়ে বায়তুল মুকাদ্দস থেকে বাগদাদ আসলো। এ কদম যেন আল্লাহর মহব্বতের পথে অটল থাকে। এখন আমি ওকে সেই শিক্ষাই দিব।

৬। ভুনা মোরগের ঘটনা

একবার এক মহিলা তার এক ছেলেকে নিয়ে গাউছে পাকের দরবারে হাজির হলো এবং আরয করলো- 'হুযুর, আমার এ ছেলেটি আপনার প্রতি খুবই আকৃষ্ট। আমি আমার যাবতীয় দাবী দাওয়া ত্যাগ করে একে আপনার তত্ত্বাবধানে দিয়ে যেতে চাচ্ছি। তিনি ছেলেটি গ্রহণ করলেন এবং ওতে মুজাহেদা, রেয়াজত ও পূর্ব সূরীদের তরীকা মতে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। কিছুদিন পর মহিলাটি ছেলেকে দেখতে আসলো। সে এসে দেখলো যে গাউসে পাক ভুনা মোরগ খাচ্ছেন আর ওর ছেলেটা এক কিনারে বসে যবের রুটি চিবাচ্ছে এবং খুবই দুর্বল ও পাতলা হয়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে মহিলাটি গাউছে পাককে লক্ষ্য করে বললো-হুযুর, আপনিতো মোরগের মাংস খাচ্ছেন কিন্তু আমার ছেলেটা শুকনো যবের রুটি খেয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। এ কথা

শুনা মাত্র তিনি মোরগের হাড়গুলোর উপর হাত বুলালেন। সাথে সাথে একটি জীবিত মোরগ হয়ে গেল এবং বাক দিতে লাগলো। তৎপর তিনি বললেন, যখন তোমার ছেলে এ ধরনের ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাবে, তখন যা ইচ্ছা, তা খেতে পারবে।

৭। গাউছে পাকের সামনে অদৃশ্য জগতের অধিবাসী

একদিন গাউছে পাক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় অদৃশ্য জগতের এক ব্যক্তি বাতাসের উপর দিয়ে বাগদাদের সীমানা অতিক্রম করেছিলেন। ওনার মাথায় একটি সাদা পাগড়ী এবং দু'কাধে দু'টি ঝাণ্ডা দেখা যাচ্ছিল। যে মাত্র গাউছে পাকের খানকার কাছাকাছি হলেন, হঠাৎ এমন ভাবে মাটিতে পতিত হলেন যেমন বাজ পাখী শিকারের উপর পতিত হয়। মাটিতে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ বেঁহুশ হয়ে গাউছে পাকের সামনে এসে রইলেন। অতঃপর গাউছে পাককে সালাম করে আকাশে উড়াল দিয়ে চলে গেলেন। লোকেরা গাউছে পাককে জিজ্ঞেস করলেন– এ কে? তিনি বললেন– এ অদৃশ্য জগতের অধিবাসী। একান্ত বেপরোয়াভাবে বাগদাদ নগরী অতিক্রম করছিলেন। এ রকম অপর একটি ঘটনা এর আগে উল্লেখিত হয়েছে।

৮। বাগদাদে অগ্নিপাত

শায়খ বকা বিন বতু (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এক যুবককে হযরত সৈয়্যদেনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর দরবারে নিয়ে এসে বললো-'হুযুর এ যুবকের জন্য একটু দুআ করুন। খোদার কসম, এ আমার ছেলে।' আসলে লোকটি মিথ্যা বলেছিল এবং উভয়ে অসৎ প্রকৃতির লোক ছিল। হুযূর গাউছে পাক খুবই রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, অবস্থা কি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে মানুষ আমার সামনেও মিথ্যা বলতে লজ্জাবোধ করছে না। এ রাগান্বিত অবস্থায় লোকদ্বকে তিনি মজলিস থেকে উঠে ঘরে চলে গেলেন। এ দিকে সেই অসৎ প্রকৃতির লোকদ্বয়ের ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো এবং আশে পাশে এ আগুন ছড়িয়ে পড়লো। আমার মনে হলো, বাগদাদে খোদার গজব নাযিল হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের মত আগুন বর্ষিত হচ্ছিল। আমি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় গাউছে পাকের দ্বারে প্রবেশ করলাম। তখনও তিনি রাগান্বিত ছিলেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম এবং একান্ত সাহস করে বললাম- হুযুর! আল্লাহর মখলুকের প্রতি রহম করুন। অনেক কিছু ঘটে গেছে। আমার প্রার্থনায় তাঁর রাগ প্রশমিত হয় এবং আগুন নিভে যায়।

ভর্তি চলিতেছে

Pdf by Masum Billah Sunny

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

বঙ্গবন্ধু লে' কলেজে (পীর জঙ্গী মাজারের নিকটে)
মতিঝিল,ঢাকা-১০০০
০১৭১১১৭৬১২৭, ০১৫৫২৪৬৯১৪৫, ০১৭১১১৪৬৩৫২

হযরত পীর বদর শাহ (রহঃ) ও মুসলমানদের প্রথম চট্টগ্রাম বিজয়

আহমদ মমতাজ

চট্টগ্রামের সাথে আরব ও পারস্য দেশের সম্পর্ক অতি প্রাচীনকাল থেকে। খ্রিষ্টিয় অষ্টম-নবম শতক থেকে সেসব দেশের মুসলিমদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে চট্টগ্রামের জনসাধারণের পরিচয় ঘটে। তবে চট্টগ্রামে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের (১২০৪-৬ খ্রি.) ১৩৫-৩৬ বছর পর। এর অন্যতম কারণ ছিল ভূ-প্রাকৃতিকভাবে চট্টগ্রামের দূর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত পাহাড়-পর্বত এবং নদী, খাল ও সমুদ্র বেষ্ঠিত অঞ্চল হিসেবে বিশ্বখ্যাতি। তদুপরি আরাকানীদের দুর্দান্ত উপস্থিতি এবং চট্টগ্রামের দখল নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে সার্বক্ষণিক যুদ্ধ পরিস্থিতি। বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে চট্টগ্রাম বিজয়ের লক্ষ্যে মুসলিম শাসকদের মধ্যে তেমন কোন প্রস্তুতি ও যুদ্ধ অভিযানের কথা ইতহাসে উল্লেখ নেই।

চট্টগ্রামে মুসলমানদের আগমন মূলতঃ ব্যবসায়িক কারণে। আরবদের ব্যবসায়িক খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। তাদের পণ্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে কেনা-বেচা করতো এবং আশপাশের বন্দরে ও দেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতো। প্রাকৃতিক দূর্যোগ সহ বিভিন্ন কারণে দীর্ঘ সময় আরবীয় বণিকেরা চট্টগ্রামে অবস্থান করতো।

চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। এখানকার সম্পদও সীমাহীন। পাহাড় নদী ও খাল-বিলের আধিক্যের কারণে ভূমিও খুব উর্বর। ব্যবসা-বাণিজ্য এমনিক বসবাসের জন্যও চট্টগ্রাম প্রাচীনকাল থেকে বিদেশীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আরব-পারস্য দেশের লোকেরা চট্টগ্রামের আকর্ষণে বসতি স্থাপন শুরু করে। এখানকার মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দাম্পত্য জীবনও শুরু করে। ক্রমে আরব বংশধরদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। একই সাথে চট্টগ্রামের আধ্যাত্মিক টানে আগমন ঘটতে থাকে আরব-পারস্য ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সুফী-সাধকগণের। ফলে ইসলামের আলোয় চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল আলোকিত হয়ে ওঠে। শুধু চট্টগ্রামে সীমাবদ্ধ থাকেননি তাঁরা। ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে আরাকানের আকিয়াব রোসাঙ্গ মালয় প্রভৃতি অঞ্চলেও চলে যান সুফী সাধকগণ। ফলে খ্রীষ্ট্রিয় চতুর্দশ শতকের শুরু থেকে সুফী সাধকদের মাধ্যমে ইসলামের মহান বাণী পৌছে যায় চট্টগ্রাম ও প্রতিবেশী দেশসমূহে। এ সব স্থানে সুফীদের সমাধি রয়েছে।

চট্টগ্রামে প্রথম যে সুফী-সাধক পদার্পন করেন ও ইসলামের বাণী লোকমাঝে প্রচার করেন তিনি হযরত পীর বদর শাহ (রহঃ)। তাঁর আগমনের সঠিক সন-তারিখ জানা না গেলেও ধারণা করা হয় চতুর্দশ শতকের শুরুতে তিনি চট্টগ্রাম, আকিয়াব, কুতুবদিয়া ও কক্সবাজার হয়ে সমূদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। আকিয়াবে (বর্তমান মিয়ানমার) তিনি বেশ কিছুদিন থাকেন। সেখানে তাঁর আস্তানা শরীফ ও মসজিদ বিদ্যমান রয়েছে। আকিয়াব থেকে আসেন টেকনাফের নিকটবর্তী শাহপুরীর দ্বীপে। এখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানে আস্তানা শরীফ ও মসজিদ ছিল, যা উনিশ শতকের প্রথম দশকে নদীগর্ভে বিলীন হয়। তাঁর স্মৃতি বিজড়িত স্থান বদর মোকাম নামে পরিচিত।

অতঃপর হযরত বদর শাহ কক্সবাজার আসেন। কিছুকাল থেকে ইসলাম প্রচার করেন। স্থাপন করেন খানকাহ শরীফ ও মসজিদ। কক্সবাজার শহরে (সদর থানায়) হযরত বদর শাহের স্মৃতি বিজড়িত মসজিদ ও খানকাহ্ স্থানটি বদর মোকাম নামে পরিচিত। সেখান থেকে নিকটবর্তী বদরখালিতে আসেন। সাগর পাড়ে অবস্থিত এ স্থানটিতে তাঁর খানকাহ শরীফ ছিল। যা 'বদরখালি' নামে স্মৃতি বহন করছে।

হযরত বদর শাহ (রহঃ) এর সাথে কতিপয় সঙ্গী ছিলেন। যাঁরা বার আউলিয়া নামে সুপরিচিত। সঙ্গীদের

নিয়ে তিনি কুতুবদিয়া দ্বীপে আসেন। দ্বীপাঞ্চলটি তখনও সমুদ্র বক্ষ থেকে ভেসে উঠেনি। আউলিয়াগণ এখানে এসে নামাজ আদায় করেন। হযরত বদর শাহ এর সঙ্গীদের একজন ছিলেন শাহ কুতুব উদ্দিন আউলিয়া। তিনি সেখানেই থেকে যান। জনশ্রুতি অনুসারে, এরপরেই দ্বীপ গড়ে উঠে ও জনবসতি স্থাপিত হয়। হযরত শাহ কুতুব উদ্দিনের নামানুসারে কুতুবদিয়া নামকরণ হয়।

হযরত শাহ বদর (রহঃ) কুতুবদিয়া থেকে চলে যান পূর্বদিকে বাঁশখালী অঞ্চলে। সেখানকার সাগর পাড়ে আস্তানা স্থাপন ও মসজিদ নির্মাণ করেন, যা বদর মোকাম নামে সুপরিচিত। সেখান থেকে সরাসরি চলে আসেন নদীপথ ধরে চট্টগ্রাম শহরে। বঙ্গোপসাগরের মোহনা হয়ে কর্ণফুলি নদীর পাথরঘাটায় অবতরণ করেন। কথিত আছে, হযরত বদর শাহ (রহঃ) একখানি কুদরতি পাথরে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রাম আসেন। সেই পাথর আজো তাঁর মাজার শরীফ প্রাঙ্গণে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রায় ৭ ফুট দীর্ঘ ও ২ ফুট প্রশস্ত পাথরের সাথে কয়েকটি বৃহৎ আকৃতির শ্বেত বর্ণের সামুদ্রিক শামুক রয়েছে, যেগুলি হযরতের সমুদ্র যাত্রায় সফর সঙ্গী ছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

হযরত বদর শাহ কর্ণফুলি নদীর যে স্থানে পাথর থেকে অবতরণ করেন সে স্থান পাথরঘাটা নামে নামকরণ হয়েছে। নদী সংলগ্ন একটি অনুচ্চ টিলায় আরোহন করে তিনি খানকাহ বা আস্তানা স্থাপন করেন। এখানে এসে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় মসজিদ ও খনন করা হয় পুকুর, যা বদর মসজিদ ও বদর পুকুর নামে পরিচিত।

চট্টগ্রামে সেকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বলতে আরাকানী মঘ, বড়ুয়া, বৌদ্ধ ও সনাতনধর্মী হিন্দু জনগোষ্ঠী বসবাস করতো। চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ছিল সৈন্য ছাউনী। মাটি ও কাঠের তেরী দূর্গ। সাগর ও নদী তীরবর্তী মানুষ ছিল মঘ জলদস্যুদের দ্বারা নির্যাতিত। আরাকানীদের অত্যাচার-নিপীড়নে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে বিরাজ করছিল অসন্তোষ। বর্ণ বৈষম্য ও জাতিগত বিদ্বেষ সমাজের শান্তি-শৃংখলাকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। এমনি পরিস্থিতিতে হযরত বদর শাহ (রহঃ) এর নেতৃত্বে কতিপয় আউলিয়ার আহবানে দলে দলে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। সুফী-সাধকদের প্রচার-প্রচারণায় ইসলাম ধর্ম চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশ থেকে আসতে থাকে ধর্মপ্রচারকগণ। তন্মধ্যে বারজন আউলিয়া মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। সেজন্য চট্টগ্রামকে বার আউলিয়ার দেশ বলা হয়। হযরত বদর শাহকে বলা হয় বার আউলিয়ার সর্দার।

সে সময় বাংলার শাসক ছিলেন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-৪৯ খ্রি.)। সুফী দরবেশদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারক পীর বদর শাহ (রহঃ) এর কথা তিনি শুনে থাকবেন। সুফীদের চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে বাধা প্রদান করছিল আরাকানী শাসক ও সৈন্যরা। স্থানীয়ভাবেও সুফী-দরবেশদের প্রতি বিদ্বেষ ছিল। কারণ ইসলামের দ্রুত প্রচার ও প্রসারকে সহজভাবে মেনোনিতে পারেনি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী। তারা ইসলামের আবির্ভাবে শংকিত হয়ে ওঠে। ধারণা করা হয়, হযরত বদর শাহ (রহঃ) পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বাংলার সুলতানকে চট্টগ্রামে অভিযান পরিচালনার জন্য আহবান জানান। (বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে।) সুলতান সেনাপতি কদল খান গাজীকে সসৈন্যে চট্টগ্রামে অভিযান পরিচালনা করতে নির্দেশ দেন। সুতলান স্বয়ং ফেনী শহরের অদূরে শর্শদি নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেন। কদল খান গাজীর নেতৃত্বে সৈন্যরা ফেনী নদী অতিক্রম করে চট্টগ্রামে প্রবেশ করে ও চট্টগ্রাম বিজয় সম্পন্ন করে। সুতলান শর্শদিতে একটি বিশালাকার দীঘি ও মসজিদ নির্মাণ করেন। অদ্যাবধি সেই মসজিদ (সংস্কারকৃত) ও দীঘি বিদ্যমান।

জনশ্রুতি রয়েছে, হযরত বদর শাহ (রহঃ) ও অন্যান্য সুফী-দরবেশগণ মুসলমান সৈন্যদের চট্টগ্রাম বিজয় অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে সহায়ত করেন। চট্টগ্রাম বিজয় সম্পন্ন হলে হযরত বদর শাহ শহরের মাঝখানে একটি সুউচ্চ টিলায় আরোহন করে একটি চেরাপ বা চাটিতে আগুন জ্বালিয়ে চট্টগ্রামে ইসলামের বিজয় ঘোষণা করেন। সে সময় থেকে পাহাড়টি 'চেরাগী পাহাড়' নামে অভিহিত হয়ে আসছে। চট্টগ্রামে জনসাধারণ মাটির তৈরী প্রদীপকে চেরাগ বা চাটি বলে থাকেন। হযরত বদর শাহ

কর্তৃক চেরাগ বা চাটি জ্বালানোর স্মারকরূপে 'চেরাগী পাহাড়' বিগত প্রায় ৬৭০ বছর ধরে মুসলমানদের চট্টগ্রাম বিজয়ের স্মৃতিকে ধারণ করে আছে। তবে পাহাড়াটির আদি রূপ আর নেই। নগরায়নের প্রেক্ষাপটে সড়ক নির্মাণের প্রয়োজনে পাহাড়টির চারদিকে মাটি কেটে ক্ষুদ্রাকৃতি করা হয়েছে। তবুও চেরাগের আদলে মাটির পাহাড়টির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো। বিগত বিশ শতকের শেষ দশকে মাটির পাহাড়টিকে আরো কেটে ছেঁটে মাটির ঢিবির চতুর্দিকে ইটের দেয়াল তুলে তৈরী হয়েছে একটি স্মারক সৌধ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রায় ৫৫ ফুট উঁচু ও ৪৬ মিটার ব্যাসে ১৬টি স্তম্ভের উপর নির্মাণ করেছে এই সৌধ। এর শীর্ষে মিনার, নীচের চতুর্পাশে ফুলবাগান, আলোক সজ্জার ব্যবস্থা ও সিঁড়ি বানিয়ে আধুনিক স্থাপত্য কীর্তির সম্মিলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সে সময় সৌধটির স্থাপত্যরীতি ও নির্মাণ পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল, যা কর্তৃপক্ষের গ্রাহ্য হয়নি। ইতিহাস গবেষকদের মতে, পুরোনো আঙ্গিক ঠিক রেখেই ইসলামি স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করে সুউচ্চ মিনার সংযুক্ত করে ইসলামের বিজয় নিশানকে প্রাধান্য দেওয়া যেতো। তাছাড়া স্মারক সৌধটির পাদদেশে হযরত পীর বদর শাহ (রহঃ) স্মৃতি বিজড়িত স্থান ও সে সাথে মুসলমানদের প্রথম চট্টগ্রাম বিজয় কাহিনীও সংক্ষিপ্তাকারে শ্বেতপাথরে লিপিবদ্ধ করা যেতো। তাহলে যুগ যুগ ধরে আগত পর্যটক, গবেষক ও ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের জানার প্রয়োজন মেটাতো। পূর্বেকার স্মারক সৌধে এমনই একটা প্রস্তর লিপি ছিল।

ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে যে, হযরত বদর শাহ এর আগমনের পূর্বে চট্টগ্রাম জ্বীন, পরী ও দৈত্য-দানবদের আধিপত্য ছিল। পীর বদর তাদের কাছে নামাজ আদায় করার জায়গা চেয়ে নেন। তিনি পাহাড়ে উঠে নামাজ আদায় করে পকেট থেকে দুটো পাথর বের করে একটি সাথে অন্যটি ঘষে চেরাগ বা চাটিতে আগুন জ্বালিয়ে দেন। কুদরতি চেরাগের আলোয় জ্বীন-পরীরা চট্টগ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। * (অনেক ঐতিহাসিক গবেষক বলেন- জ্বীন-পরী বিতাড়ন বলতে মঘ জলদস্যু ও লুটেরা-হামাদদের বুঝানো হয়েছে।) চেরাগ থেকে চেরাগী পাহাড় এবং চাটি থেকে চাটিগ্রাম বা চাটিগাঁ নামকরণ হয় বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত। যদিও চট্টগ্রাম নামকরণের উৎপত্তি নিয়ে আরো ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। আজ পর্যন্ত ৩২টি নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন পর্যটক, ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। তন্মধ্যে চট্টল, চৈত্যগ্রাম, সপ্তগ্রাম, চট্টলা, চাটিগাঁও, ইসলামাবাদ, চিটাগাং, সোদকাওয়ান উল্লেখযোগ্য। 'আউলিয়া বা ওলীদের চাটির মাহাত্ম্যে চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তির সর্বপ্রথম লিখিতভাবে পাওয়া যায় ঐতিহাসিক হামিদুল্লাহ খানের রচনায়।' তবে হযরত বদর শাহ (রহঃ) কর্তৃক চাটি বা চেরাগ জ্বালানোর স্থান চেরাগী পাহাড় এবং চাটি থেকে চাটিগাঁও, চাটগাঁ বা চাটিগ্রাম ও পরবর্তীতে সংস্কৃত প্রভাবিত চট্টগ্রাম সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় মত। এখানকার অধিবাসীরা চাটগাঁইয়া বা চাটিগাইয়্যা নামে অভিহিত।

হযরত বদর শাহ (রহঃ) এর চট্টগ্রাম অবস্থানকালে ও ইসলাম প্রচারকালে সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ এর নির্দেশে সেনাপতি কদলখান গাজী কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজিত হয়–একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রামাণ্য সত্য। মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতার রচনা ও মোগল ঐতিহাসিক শিহাব উদ্দিন তালিশের ফতীয়া ইব্রিয়া গ্রন্থে এর প্রমাণ মেলে। এছাড়া চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের তথ্য পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকের কবি মোহম্মাদ খানের 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে (রচনাকাল ১৬৪৬ খ্রি.)। কবি তাঁর পিতা-মাতার বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে সর্বপ্রথম মুসলমানদের চট্টগ্রাম বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি চট্টগ্রামের বার জন আউলিয়ার কথাও লিখেছেন এবং সেনাপতি কদল খান গাজীকেও কবি বার আউলিয়ার অন্যতম বলেছেন।

কায়মনে প্রণাম করি বারে বার।
কদল খান গাজী জান ভূবনের সার।

কবি মোহাম্মাদ খান অন্যত্র বলেছেন–

একাদশ মিত্র সঙ্গে কদলগাজী রঙ্গে
দুই মিত্রে বাড়ী লই গেলা।
হাজী খলিলকে দেখি বদর আলাম সুখী
অন্যে অন্যে আশ্বেসিলা॥

অর্থাৎ এগারজন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে কদল খান গাজী বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন ও পীর বদর

শাহ এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। পীর বদর হাজী খলিলকে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। কবি মোহাম্মদ খান তাঁর 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে বার আউলিয়ার কথা লিখলেও তাঁদের সবার নাম বলেননি। তিনি লিখেছেন-কদল খানগাজী, বদর আলম (পীর বদর শাহ) হাজী খলিল পীর, শায়খ শরিফুদ্দীন ও মাহি আসোয়ার এই পাঁচ জনের নাম। কবি 'পুস্তক বাড় এ হেতু না লেখিলু নাম' অর্থাৎ পুস্তকের আকার বৃদ্ধি পাবার আশংকায় বাদবাকী আউলিয়াদের নাম উল্লেখ করেননি। সেই সাথে বাকী সাত জনের নাম জানার সম্ভাবনাও আপাততঃভাবে আর থাকলোনা। কোন কোন লেখক ও গবেষক এঁদের নাম দেওয়ার চেষ্টা করলেও তা ইতিহাসের আলোকে গ্রণযোগ্যতা পায়নি। ঐতিহাসিক প্রফেসর আব্দুল করিমও এরূপ মত পোষণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে চট্টগ্রাম বিজেতা হযরত বদর শাহ ব্যতিত আরো চার জন আউলিয়ার নাম ও চট্টগ্রাম বিজয়ে তাদের ভূমিকার কথা সংক্ষিপ্তকারে মক্তুল হোসেন কাব্যগ্রন্থে পাওয়া গেলেও তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়না। কেবল মাত্র হযরত বদর শাহ (রহঃ) কিছু কর্মকাণ্ড, চট্টগ্রাম, অকিয়াব এর বিস্তীর্ণ এলাকায় তাঁর আধ্যাত্মিক পরিচিতি, কেরামত, প্রভাব ও সেসব এলাকায় স্মারক চিহ্ন এবং চট্টগ্রামের বদর পট্টিতে তাঁর সমাধি, মসজিদ, পুকুরসহ অন্যান্য স্মারক জীবন ও কর্মকাণ্ডের পরিচয় মেলে। ঐতিহাসিক শিহাব উদ্দীন তালিশ, কবি মোহাম্মদ মুকীম (অষ্টাদশ শতকে, গুলে বাকাওয়ালী কাব্যে), মোহাম্মাদ খান (মক্তুল হোসেন কাব্য) এবং দৌলত উজির বাহরাম খান (ইমাম বিজয়-১৫৪৫ খ্রি. ও লায়লী মজনু-১৫৬৫) প্রমুখ ঐতিহিসক। সমাজ সচেতন কবি তাঁদের রচনাবলীতে হযরত বদর শাহ (রহঃ)কে চট্টগ্রাম বিজেতা ও ইসলাম প্রচারক এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের অভিভাবক দরবেশরূপে মর্যাদা দিয়েছেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর আব্দুল করিম তাঁর দীর্ঘকারে গবেষণায় 'হযরত বদর শাহ (রহঃ) চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেছেন এবং বদরপট্টিতে তাঁর মরদেহ সমাহিত আছে' বলে দৃঢ়ভাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

তবে কতিপয় লেখকের কারণে জনমনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, 'হযরত বদর শাহ (রহঃ) এর সমাধি নামে বদরপট্টিতে যা আছে তা প্রকৃতপক্ষ তাঁর আস্তানা শরীফ মাত্র। তাঁর মাজার বিহারে অবস্থিত।' কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ ও সাক্ষ্যমতে, হযরত বদর শাহ (রহঃ) এর সমাধি বিহারে নয়, চট্টগ্রম শহরের লালদীঘির পূর্ব পার্শ্বে বদরপট্টিতে অবস্থিত। বিহারে অন্য কোন শাহ বদর বা বদর আল্লামার মাজার অবস্থিত। নামের মিল থাকলেই কেবলমাত্র একই ব্যক্তি হয়ে যাননা। বাংলা বিহারে বদর নামে আরো একাধিক সুফী দরবেশের মাজার রয়েছে। তবে গবেষকদের কেউ কেউ বলেন বদর শাহ সিলেট বিজেতা (১৩০৩ খ্রি.) হযরত শাহজালাল ইয়েমেনী (রহঃ) এর সঙ্গী ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম এবং হযরত শাহ জালালের নির্দেশে তিনি প্রথমে তরফ রাজ্য (হবিগঞ্জ) ও পরবর্তীতে আসামের করিমগঞ্জে ইসলাম প্রচার করেন। করিমগঞ্জে তাঁর আস্তানা শরীফ রয়েছে। যা বদরপুর নামে পরিচিত। সেখান থেকে তিনি চট্টগ্রামে আসেন ও ইসলাম প্রচার করেন। চট্টগ্রামেই তিনি ইন্তেকাল করেন ও এখানে তাঁর সমাধি বিদ্যমান।

প্রকৃতপক্ষে হযরত শাহ জালাল (রাঃ) এর সঙ্গী ৩৬০ আউলিয়ার একজনের নাম বদর পীর এবং তিনি তরফ রাজ্য পরবর্তীতে করিমগঞ্জ জয় করে সেখানে ইসলাম প্রচার করেন বলে জানা যায়। কিন্তু তিনিই চট্টগ্রাম বিজেতা ও ইসলাম প্রচারক হযরত বদর শাহ এমন কোন দালিলিক প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। তবে এই ধারণা সত্য হলেও হতে পরি। কিন্তু বিহারের বদর পীর সম্পুর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। প্রফেসর আব্দুর করিম, ড. মুহাম্মাদ এনামুল হক প্রমুখের তাই মত। ষোড়শ শতকের কবি বাহরাম খান ১৫৪৫ সালের কিছু পরে চট্টগ্রামে শহরের কিছুদূর উত্তরে বসে 'ইমাম বিজয়' এবং তার ২০ বছর পর 'লায়লী মজনু' কাব্য রচনা করেন। তিনি জাফরাবাদ রাজ্যের (চট্টগ্রাম) শাসক নিজাম শাহ সুরের (দিল্লীর সম্রাট শের শাহ এর ভাই) দৌলত উজির (অর্থমন্ত্রী) ছিলেন। সেকালের কবি সাহিত্যিকগণ প্রথা অনুযায়ী নিজ বংশ পরিচয় ও সমসাময়িক কালের আনুপূর্বক বর্ণনা দিতেন। হযরত বদর শাহ সম্পর্কে তিনিই প্রথম (এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মতে) ইমাম বিজয় কাব্য গ্রন্থে লিখেছেন-

সহর জফরাবাদ নামে চাটিগেরাম
তথাতে বৈসত্র পীর বদর আলম॥
দোআদশ আউলিয়া বর জগত উত্তম।
একেহ স্থাপিত মোকাম মনোরম॥

কবি বাহরাম খান তাঁর 'লায়লী মজনু' কাব্যে হযরত বদর শাহকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন-

লবনাম্ব সন্নিকট কর্ণফুলি নদীতট
শুভপুরি অতি দিব্য ধাম।
চৌদিকে পর্বতগড় অধিক উজ্জলতর
তাত শাহা বদর আলম॥

ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণে দেখা যায় হযরত পীর বদর শাহ (রহঃ) চট্টগ্রামে আগমন করেন চতুর্দশ শতকের শুরুতে এবং তিনি দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। প্রায় সমসাময়িককালের সিলেট বিজেতা হযরত শাহজালাল ইয়েমেনী (রহঃ) ১৫০ বছর হায়াত কাটিয়ে ১৩৪৭-৪৮ সালে ইন্তেকাল করেন বলে বিশ্বখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সাক্ষ্য দিয়েছেন। উপরোক্ত আলোচনায় ও ইতিহাসবিদদের মতামত অনুযায়ী এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, হযরত পীর বদর শাহ (রহঃ) চট্টগ্রামে দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে এবং বহু স্মৃতি-স্মরক রেখে এখানেই ইহলোক ত্যাগ করেন। এখানেই তাঁর সমাধি বা মকবেরা অবস্থিত। (এ সংক্রান্ত বিস্তারিত দ্রষ্টব্য মং প্রণীত চট্টগ্রমের সুফী সাধক, দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা : ২০৫-৩৯)।

চট্টগ্রামের অভিভাবক দরবেশরূপে হযরত বদর শাহ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। বাংলার মাঝি মাল্লারা তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকেন। সমুদ্রগামী জাহাজ-নৌকার নাবিক ও যাত্রীরা যাত্রার পূর্বে হযরত বদর শাহ এর মাজার জিয়ারতসহ শিরনী ছালাত করে থাকেন। এটী প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। শিহাবুদ্দিন তালিমের মতে আরাকানের বৌদ্ধ শাসকগণ তাঁর সমাধি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েকটি গ্রাম লিখে দেন। মোগল শাসনামলেও শাসকগণ তাঁকে বিশেষ সম্মান করতেন ও মাজারে এসে জেয়ারত ও শিরনী ছালাত করে যেতেন। মোঘল যুগেও জমি দানকরা হয় মাজার-খানকাহ শরীফ, মসজিদ ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষনের ব্যয় নির্বাহের জন্য। জানা যায় দিল্লীর সম্রাট ৮০ দ্রোন সম্পত্তি লাখেরাজ করে দিয়েছিলেন। চট্টগ্রামের মত আকিয়াবের ধর্মপ্রাণ জনগণ হযরত বদর শাহকে বিশেষভাবে মান্য করেন। বাংলার হিন্দু-মুসলিম ও বৌদ্ধরা শত শত বছর ধরে সমুদ্র যাত্রার সময় 'বদর বদর' ধ্বনি দিয়ে সমস্বরে হযরত পীর বদরকে স্মরণ করেন। শুধু যাত্রী, নাবিক বা মাঝি মাল্লারা নয় গ্রামাঞ্চলে খেলোয়াড়রা খেলার মাঠে নামার পূর্বে 'বদর বদর' বলে ধ্বনি দিয়ে মনোবল ও সাহস সঞ্চয় করে থাকে। বিগত পৌনে সাত শত বছর ধরে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিদিন শত শত অভাব, দুর্দশা ও বিপদগ্রস্থ নারী-পুরুষ এসে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায়। প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ৯ তারিখ দিবাগত রাতে পবিত্র উরস অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরান শরীফ তেলাওয়াত, জিকির মাহফিল, মিলাদ ও দেয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এছাড়া প্রতিদিন বাদ মাগরেব মাজার শরীফ লঙ্গরখানায় মাজারে আগত জেয়ারতকারী, ভক্ত-অনুরাগী ও গরীব দুস্থ নারী পুরুষদের মাঝে তবাররুক বিতরণ করা হয়। শত শত বছর ধরে লঙ্গরখানা চালু রয়েছে।

চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলার সমাজ জীবনে হযরত পীর বদর শাহ এর অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। ১৯৩৭-৩৮ সাল বদর শাহ (রহঃ) এর মাজার জেয়ারতকারী প্রথিতযশা এক সাংবাদিক তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন "আব্বার পিছনে হেঁটে একটি মাজরের সামেন এসে দাঁড়ালাম। রাস্তা থেকে উঁচুতে সিঁড়ি উঠে গেছে মাজার চত্বর। হযরত বদর শাহ (রহঃ) বার আউলিয়ার একজন। তাঁর মাজারে ঢুকলাম আববার সঙ্গে জিয়ারত করতে। আববা জানালেন, কোথাও যেতে হলে শুভ কাজে, যাত্রায় অথবা নির্বিঘ্ন নিরাপদ ভ্রমণের যাত্রালগ্নে এই আউলিয়ার দোয়া নিতে হয়। চাটগাঁ-নোয়াখালীর মাঝি-মাল্লারা সেই কোন অনাদিকাল থেকে পাল তুলে জাহাজ ভাসাতেন "বদর শাহের মাজারে এসে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দিতেন।" (এ.বি.এম. মুসা চট্রল স্মৃতি, দৈনিক যুগান্তর ১৩ ডিসেম্বর ২০০৪) পূর্বে বদর পীরের দরগাহে বার্ষিক ওরস মহাধুমধামের সাথে পালিত হতো। অসংখ্য গরু জবাই করে লোকদের খাওয়ানো হতো। যা "বদরের শিরনী" নামে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয় ঃ "বিলর গরু, বদরের শিন্নি"।

কেঅয় পাইল ঘড়া ঘড়া
কেহয় পাইল ইক্কিনি॥

অর্থাৎ মাঠের গরুর পালের মত অসংখ্য গরু জবাই করে বদর শাহর শিরনী রান্না হতো আর তা খেতো হাজারো ভক্ত অনুরাগী ও জেয়ারতকারীগণ। ফলে শেষ দিকে যারা আসতো তাদের ভাগে অতি সামান্যই পড়তো।

হযরত বদর শাহ (রহঃ) এর সঙ্গী সাথীদের মধ্যে উপরোল্লিখিত বার জন আউলিয়া ব্যতিত বিশেষ করে হযরত শাহ মুহসিন আউলিয়া ও কাতাল পীরের নাম জানা যায়। আনোয়ারা উপজেলায় মুহসিন আউলিয়ার মাজারে যে দুই লাইন বিশিষ্ট তোঘরা হরফে লেখা প্রস্তর খন্ড রয়েছে তার কিছু অংশ অস্পষ্ট ও দুস্পাঠ্য। পাঠযোগ্য অংশমতে মুহসিন আউলিয়ার মৃত্যু সন ৮০০ হিজরী অর্থাৎ ১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। হযরত মুহসিন আউলিয়ার সমসাময়িক হলেও বদর শাহ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু মুহসিন আউলিয়ার মৃত্যুর পূর্বে।

এছাড়া খাদেম ও অন্যান্য শিষ্য-সঙ্গীদের নাম পরিচয় কালের অতলে হারিয়ে গেছে। শাহ আতাউল্লাহ নামে একজনের কবর রয়েছে বদর শাহ'র মাজারের পূর্ব পাশে। বর্তমান মোতওয়াল্লীর মতে, শাহ আতাউল্লাহ হযরত বদর শাহের একমাত্র বংশধর। কিন্তু এর পক্ষে কোন দালিলিক প্রমাণ নেই। তাঁর কাছে জানা যায় জিন্নে গোলামী, জিন্নে গরীববুল্লাহ, জিন্নে আতাউল্লাহ (উল্লেখিত), জিন্নে রমজানি এবং অতঃপর মওলানা সৈয়দ আড়ি খোন্দাকর, তৎপুত্র সৈয়দ কলিমুল্লাহর নাম। তার পরবর্তী বংশধরগণ সৈযদ ইজ্জতুল্লাহ, সৈয়দ দেরাজতুল্লাহ ফকির, সৈয়দ আবুল কাশেম ও সৈয়দ আহম্মদ হোসেন। শেষোক্ত দু'ব্যক্তি যথাক্রমে ৫৫ বছর ও ৪৫ বছর মাজার শরীফের খাদেম ও মোতওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন করেন।

বদর পীরের মকবরা বা সমাধি ভবনটি সুলাতানী আমলে নির্মিত। মোগল ঐতিহাসকি শিহাবুদ্দীন তালিশের মতে, দরগাহ ভবনটি সোনারগাঁও এর শাসনকর্তা ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ'র আমলে নির্মিত। সংলগ্ন স্থানে রয়েছে একটি মাটির কুয়া বা ইদারা। যার পানি বদর শাহ স্বয়ং ব্যবহার করতেন। এখানে সংরক্ষিত রয়েছে বদর পীরর কথিত স্বহস্তে লিখা শিলা লিপি। তোঘরা হরফে লেখা অস্পষ্ট ও দুস্পাঠ্য। পুরো মকররা এলাকাটি অনুচ্চ টিলা বিশেষ। প্রাচীন প্রবেশ পথ ছোট গম্বুজ বিশিষ্ট দরওয়াজা যা আজো দৃশ্যমান ছিল পূর্বদিকে, যার নিদর্শন দৃশ্যমান। পূর্বদিকে বকশির হাটের গলিপথ। যেখানে রয়েছে এক আস্তানা শরীফ, মাটির তৈরী বলে 'মেইট্যা মাজার' নামে সুপরিচিত।

মকবরা শরীফের পূর্ব দিকের টিলার কবরস্থানে খাদেম ও মোতওয়াল্লীদের বংশধরেদের সমাহিত করা হয়। বর্তমানে প্রবেশপথ পশ্চিম দিকে। গলির মুখে বদর শাহর স্মৃতি বিজরিত দ্বিতল মসজিদ ও পুকুর। পুকুরে পশ্চিম পাড়ে চট্টগ্রামের শহর কুতুব শাহ আমানতের দরগাহ্ শরীফ। বদর পুকুরের পানি প্রধান উক্ত কুতুব হযরত শাহ আমানতের জেয়ারতকারী, মসজিদের মুসল্লি ও সংশ্লিষ্টরা ওজু গোসলের কাজে ব্যবহার করে। হযরত পীর বদর শাহ এর মক্কবরা শরীফের উত্তর পূর্ব কোণে খাদেমগণ কর্তৃক স্থাপিত হয় একটি সুউচ্চ মিনার।

হযরত বদর শাহ (রহঃ) এর বেশ কিছু স্মারক স্মৃতি রয়েছে মাজার শরীফ ও অন্যান্য অঞ্চলে। চট্টগ্রাম শহরে চেরাগী পাহাড়, বদর ঝর্ণা (বাটতলী স্টেশন সংলগ্ন). মাজারে রক্ষিত চেরাগ বা চাটি (এ চাটি প্রতি রাতে মূলমাজারে জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সকালে ফজরের নামাজ আদায়ের পর সে আলো নিভানো হয়। সরিষার তৈলের সাথে ঘি মিশ্রণ করে চেরাগ জ্বালানোর রেওয়াজ প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত) এবং চট্টগ্রামের বাইরে বিভিন্ন স্থানে বদর মোকাম, বদর মসজিদ তাঁর পূর্ণ স্মৃতি বহন করছে।

চট্টগ্রাম বন্দর-শহর রূপে দু'হাজার বছরের বেশী প্রাচীন– একথা আরব নাবিক-ভৌগোলিক, গ্রীক-পর্তুগীজ সহ বিভিন্ন দেশের পর্যটক ও ঐতিহাসিক সূত্রে প্রমাণিত। কিন্তু সে সুপ্রাচীন বন্দর-শহরের অস্তিত্ব বা প্রাচীন স্মারক-নির্দশন কোথাও দেখতে পাওয়া যায়না। এ পর্যন্ত সবেচেয় প্রাচীন যে নিদর্শন সম্পূর্ণ দেখতে পাওয়া যায় তাহলো হযরত শাহ বদর (রহঃ) এর দরগাহ ভবন। মূল সমাধিভবনটি একগম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির পাকা দালাল। মোগল ঐতিহাসিক শিহাব উদ্দীন তালিশের বর্ণনায় 'হযরত বদর শাহ (রহঃ) দরগাহ ভবনটি আরাকানীদের চাটিগাঁ দূর্গের একপাশে অবস্থিত' বলেছেন। তাঁর বর্ণনানুযায়ী ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ এর আমলে মাজার ভবনটি নির্মিত হয়ে থাকলে তা ১৩৩৮-৪৯ খ্রিষ্টাব্দ ধরা যেতে পারে। সে দিক থেকে সমাধি ভবনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে বিশেষভাবে বিবেচ্য। ভবনটি প্রথাগতভাবে বা কোন স্বীকৃত পদ্ধতিতে সংস্কার করা হয়নি। খাদেম শাহবেদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ধারণা মতে যথেচ্চ সংস্কার ও নির্মাণ কাজের ফলে প্রাচীন

শিলালিপিটাও হারিয়ে গেছে দেওয়ালের অভ্যন্তরভাগে, অনেক নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বা বিলুপ্ত হয়েছে। হযরত শাহ বদর পীর এর স্বহস্তে লিখিত কালো পাথরের চার লাইনে লেখা অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপুর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। যার সরকারী উদ্যোগে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের তত্বাবধানে পাঠোদ্ধার সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক সম্ভবপর। ঐতিহাসিক ও মূদ্রা বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আব্দুল করিম এ লেখকের সাথে আলাপচারিতায় তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিলালিপি পাঠোদ্ধার প্রচেষ্টার কথা বলেছিলেন। সমাধি ভবনটি প্রাতিষ্ঠানিক বা স্বীকৃত পদ্ধতিতে সংস্কার হওয়াটাও জরুরী। অন্যথায় যে কোন সময় ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পের মত প্রলয়ংকারী দুর্যোগে সাড়ে ছয়'শ বছরের প্রাচীন এ সমাধি ভবনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে।

বাংলার পূর্বাঞ্চলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অভিভাবক দরবেশ রূপে সম্মানিত, ইসলাম প্রচারকারী বার আউলিয়ার সর্দার খ্যাত, মুসলমানদের সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম বিজয়ের উদ্যোগী পুরুষ, কিংবদন্তীখ্যাত হযরত পীর বদর শাহ (রহঃ) সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। অবসান হওয়া দরকার যাবতীয় ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি অলিক গল্প-কাহিনী ও অপপ্রচারের। তবেই এ মহান সাধকের প্রতি যথার্থ সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদর্শন করা হবে। সে সাথে চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের দাবী কর্ণফুলী নদীর উপর নির্মিয়মান তৃতীয় সেতু এবং সড়কপথে শহরের প্রবেশ পথে (উত্তর কাট্টলি) সিটি গেইট হযরত বদর পীর এর নামে নামকরণ বিবেশভাবে বিবেচনার দারী রাখে।

হযরত বদর শাহ সম্পর্কিত আলোচনায় ভারত মুসলিম রাজত্বের প্রাথমিক যুগের ধর্মপ্রচারক সুফী-দরবেশের ভূমিকা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। খাজা মঈনউদ্দীন চিশতীর (মৃত্যু ১২৩৬ খ্রি.) আগমনে আজমির রাজা পৃথ্বিরাজের পতন হয়, গৌড়ে রাজাগণের অত্যাচার থেকে হযরত নূর কুতুব উল আলমের (মৃত্যু ১৪১৫) আগমনে ইসলাম ও মুসলিম রাজত্ব রক্ষা পায়, শাহজাহান ইয়েমেনীর আবির্ভাবে সিলেটের রাজা গৌরগোবিন্দের পতন ঘটে ও ইসলাম কায়েম হয় এবং হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দ মুজাদ্দেদে আলফে সানীর (মৃত্যু ১৬২৪) আবির্ভাবে দিল্লীর সম্রাট আকবর এর স্বেচ্চাচারি ও ধর্মীয় অনাচার থেকে ইসলাম ও মুসলমানগণ রক্ষা পান-তেমনি হযরত বদর পীর এর আগমনে চট্টগ্রামে আরাকানী মঘ শাসন অবসান ঘটে ও ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন। বাংলাদেশের ইতিহাসে মুসলমানদের প্রথম চট্টগ্রাম বিজয় ও হযরত বদর শাহ'র ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যসূত্র ঃ

১. চট্টগ্রামে ইসলাম-ড. আব্দুল করিম, সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা।

২. চট্টগ্রামের সূফী সাধক দ্বিতীয় খন্ড-আহমদ মমতাজ, এপ্রিল ২০০৬ দিশা প্রকাশনী, ঢাকা।

৩. বদর শাহ বা বাদরু-দ্ দীন আল্লামাহ্- ড. মুহাম্মদ এনামুল হক. এনামুল হক, রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (মনসুর মুসা সম্পাদিত)

৪. ইমাম বিজয়-দৌলত উজির বাহরাম খান, সম্পাদনায়-অধ্যাপক আলী আহমদ।

৫. বন্দর শহর চট্টগ্রাম-আব্দুল হক চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা মে, ১৯৯৪।

৬. ড. আব্দুল করিম এর প্রবন্ধ-চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি, দৈনিক পূর্বকোণ, চট্টগ্রাম ১২-১৩ জুলাই ২০০৫।

৭. District Gazetteer Chittagong, 1970-page 466

৮. জালালাবাদের ইতিহাস-দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা জুন-১৯৮৩ এবং লেখকের সাথে সাক্ষাৎকার ও চট্টগ্রামের সুফী সাধক দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত মুখবন্ধ।

৯. A History of Chittagong-Dr. Suniti Bhushan Qanungo, 1988

১০. বাংলা পিডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড-এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, মার্চ-২০০৩।

১১. সৈয়দ আবুল হাশেম-মোতওয়াল্লী হযরত বদর পীর এর দরগাহ শরীফ।

১২. বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস-ড. আবুদল করিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন-১৯৯৩।

১৩. চট্টগ্রামের সুফী সাধক-প্রথমখণ্ড আহমদ মমতাজ, দিশা প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০৪।

১৪. গৌড়ে মুসলিম শাসন ও নূর কুতুব উল আলম-অধ্যাপক মুহাম্মদ সগীর উদ্দিন মিয়া, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯১।

সিরিয়াতে বন্ধী অবস্থায় পবিত্র আহলে বাইত-ই রসূল

সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

পাপিষ্ঠ ইয়াজীদের নির্দেশে দুর্ভাগা ইবনে যিয়াদ বন্ধী নবী পরিবারের সদস্যদেরকে সিরিয়ায় প্রেরণ করর সময় বন্ধী আহলে বাইতের কাফেলা দামেস্ক শহরের সদর দরজার নিকটবর্তী হলে হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে ফাতেমা (রা:) দুরাচার শিমারকে বললেন, এ শহরে প্রবেশ করানোর সময় আমাদের এমন ফকট দিয়ে শহরের ভিতরে নিয়ে যাও যেখানে অল্প সংখ্যক দর্শক জড়ো হয়েছে এবং তোমার সিপাহীদেরকে বল তারা যেন শহীদানদের পবিত্র মস্তকগুলোকে পতাকাসমূহের মধ্য থেকে বের করে আনে এবং আমাদেরকে এগুলো থেকে দূরে রাখে। কারণ আমরা ইতিমধ্যে অনেক আহত ও অপমানিত হয়েছি। আর আমরা তো বন্ধী অবস্থার মধ্যেই রয়েছি। পাপিষ্ট শিমার উম্মে কুলসুম (রা:) এর কথায় মোটেও কর্ণপাত করলনা উল্টো আরো আদেশ দিল, কর্তিত মাথাসমূহ বর্শাগ্রে বেঁধে পতাকাসমূহের মাঝেই রাখা হোক। এভাবেই বন্ধী নবী পরিবারকে দর্শকদের উপস্থিতিতে দামেস্কের প্রধান ফটকের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করানো হল। শহরের প্রধান জামে মসজিদের সামনে যেখানে যুদ্ধ-বন্ধীদের রাখা হত সেখানেই নবী পরিবারের সম্মানিত সদস্যদের রাখা হয়। নাপাক ইয়াজীদ যখন হযরত ইমাম হুসাইন (রা:) এর পবিত্র শির মোবারক দামেস্কের সদর গেটে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তখন শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী হযরত খালেদ বিন গাফরা (রা:) আত্মগোপন করে এক মাস জনসম্মুখে বের হলেন না। এক মাস পরে যখন বের হলেন লোকেরা তাঁর নির্জনবাসের কারণ জানতে চাইল। তিনি বললেন, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না এটা কেমন এক ক্রান্তিকাল? এরপর নিম্নোক্ত ছন্দমালা আবৃত্তি করলেন, "হে নবী দৌহিত্র, সিরীয়ায় আপনার রক্তাক্ত মাথা আনা হয়েছে। আপনাকে হত্যা করার অর্থই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রকাশ্য ও ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা। হে নবী দৌহিত্র, আপনাকে ওরা তৃষ্ণাতুর অবস্থায় হত্যা করেছে এবং পবিত্র কোরআনের বিধান লংঘন করেছে। আপনাকে হত্যা করার সময় ওরা তাকবীর ধ্বনী দিয়েছে। আসলে আপনাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তারা তাকবীর ও তাহলীলেরই ধ্বংস সাধন করেছে।" এরপর নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিজনদের দাঁড়িতে বেঁধে ইয়াজীদের দরবারে নিয়ে আসা হয়। ঠিক এ সময় হযরত জয়নাল আবেদীন (রা:) বললেন, "হে ইয়াজীদ, তোমাকে খোদার নামে শপথ করে বলছি, নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তুমি কেমন ধারণা পোষণ কর, যদি তিনি আমাদেরকে এ অবস্থায় দেখতে পেতেন?" তারপর কারবালার তাজেদার ইমাম হুসাইন (রা:) এর পবিত্র শির মোবারক দূর্ভাগা ইয়াজীদের সামনে আনা হয় এবং আহলে বাইতের মহিলাদেরকে ইয়াজীদের পিছনে দাঁড় করানো হয় যাতে তারা এই কর্তিত মস্ত মোবারক না দেখতে পান। ইমাম জয়নাল আবেদনী (রা:) এই দৃশ্য দেখে ফেললেন। হযরত জয়নাব (রা:) ভাইয়ের কর্তিত মাথা দেখা মাত্রই অতি করুণ স্বরে বলে উঠলেন, "ওয়া হুসাইনাহ, হায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৌহিত্র, হায় পবিত্র মক্কা-মদীনার সন্তান, হায় ফাতেমা যাহ্‌রার সন্তান, হায় মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয় দৌহিত্র"। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত সভায় যারাই উপস্থিত ছিল হযরত জয়নাব (রা:) সবাইকে কাঁদালেন। ইমামের কণ্যাদ্বয় হযরত ফাতিমা ও সাকীনা (রা:) যখনই পিতার মস্তক মোবারক দেখতে পেলেন তখন নিজেদের অজান্তেই তাঁদের অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল। এরপর পাষণ্ড ইয়াজীদ তার হাতের লাঠি দিয়ে ইমাম হুসাইন (রা:) এর পবিত্র ঠোঁট ও দাঁতে আঘাত করতে লাগল। তা দেখে সাহাবী হয়রত আবু বোরযা আসলামী (রা:) বলে উঠলেন, "পাপিষ্ঠ ইয়াজীদ, তোমার জন্য আক্ষেপ, তুমি নবী দৌহিত্রকে আঘাত করছ। আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, হাসান ও হুসাইন বেহেস্তের যুবকদের সর্দার। তিনি আরো বলেছেন, "তোমাদের হত্যাকারীকে আল্লাহ হত্যা করবেন এবং তাদেরকে নিকৃষ্ট বাসস্থান জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।" একথা শুনে ইয়াজীদ ক্ষেপে উঠল। তার নির্দেশে হযরত আবু বোরযা আসলামী (রা:)কে ঠেনে হিঁচড়ে দরবার থেকে বহিস্কার করা হয়। নরাধম, পাষন্ড ইয়াজিদ ভেবেছিল ইমাম হুসাইন (রা:) কে হত্যা করে ও তাঁর পরিবারের পবিত্র

সদস্যদেরকে অপদস্থ করে সে বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু না, সে নিজেকে ইতিহাসের পাতায় একজন হীন নিকৃষ্ট, ঘৃণ্য, পাষন্ড, দূরাচার, দুর্ভাগা, নর্দমার কীট হিসেবে ঠাঁই করে নিয়েছে। অপরদিকে হযরত ইমাম হুসাইন (রা:) কারবালা ময়দানে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সত্যের পথে অটল, অবিচল, অনমনীয় মনোবল। ন্যায়ের পক্ষে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জালিমের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও সত্যের সাক্ষ্য দান করা। ইমামের শাহাদাত মানবজাতির ইতিহাসে অতি তাৎপর্যপূর্ণ জীবন্ত স্মারক এবং সত্যপন্থীদের জন্য মহামূল্যবান উজ্জ্বল দীপশিখা। হযরত ইমাম হুসাইন (রা:) নূর নবীর দৌহিত্র, হায়দারে কাররার শাহজাদা, মা ফাতেমা যাহ্‌রার সন্তান বীরের বেশে ন্যায়ের পক্ষে পরিজনসহ অকাতরে দিয়ে গেলেন প্রাণ, উম্মোচিত করে গেলেন ভ্রান্ত ও মেকী ইমানদারদের মুখোশ আজো আছে ভ্রান্ত, ভন্ড, বর্বর ইয়াজীদের অনুসারী জোব্বা ওয়ালা ঈমানদার। যাদের বেশভুষায় সাধারণ মানুষ তটস্থ হয়ে যান। ওরা আহলে বায়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামদের অবজ্ঞা করে, অলী আউলিয়াদের শানে বিদ্রুপাত্মক কথা বলে, পবিত্র কোরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে, নিজেদেরকে হকপন্থী মুসলমান বলে দাবী করে। যেমনটি করেছিল পাপিষ্ট ইয়াজীদ, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহলে বাইত-এর প্রতি। যাঁদের সন্তুষ্টিতে মহান আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট। তাঁদের প্রতি অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালিয়েও সে নিজেকে দাবী করেছিল মুসলমান বলে। সে বেঈমান, ইতিহাসের নিকৃষ্ট, জগণ্যতম বেঈমান। ইমাম হুসাইন (রা:) এর অনুসারী সুন্নীয়তের বীর জনতা, উম্মোচন করে দাও ভ্রান্তদের ভন্ডামীর মুখোশ। কারবালার দৃপ্ত চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ভেঙ্গে দাও ইয়াজীদের দোসরদের মিথ্যার প্রাসাদ। চিহ্নিত কর বাতিল, মুনাফিক, ভন্ড, কুচক্রীদের। হে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন, আমরা যেন আহলে বায়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামদের প্রেমে উৎসর্গীত হয়ে অসত্যকে পরাভূত করে সর্বত্র সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারি। তুমি আমাদেরকে সেই শক্তি সাহস ও মনোবল দান কর। আমিন।

ওরা বাতিল

সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

এলরে ভাই ইজতেমা
প্রেমিক যত হয় জমা।
যাবে নাকি ভাই চল, চল
আরে, কোথায় যাব আগে বল।
বলছ কি ভাই, জাননা
শুরু হয়েছে ইজতেমা,
শত শত মানুষ গিয়ে
টঙ্গীর মাঠে হচ্ছে জমা।
ফিরবে কাঁধে ঝোলা নিয়ে
চিল্লা করবে গ্রামে গিয়ে।
এক রাকআত নামাজ পড়লে
সাত লক্ষ সওয়াব মিলে,
তাই তোমায় বলছি ভাই
দ্রুত এস তাবলীগের দলে।
বুঝলাম তবে মৌলভী সাব
নাও তোমার কথার জবাব।
ঝোলা নিয়ে গ্রামে গ্রামে
করবে ঘোরাঘুরি,
নবীর শানে পড়লে দুরুদ
মাথায় পড়ে বাড়ি।
ইসলামের মূল ভিত্তি
পাঁচটি আমরা জানি।
তাবলীগীদের মুখে এখন
ছয় উছুলের কথা শুনি।
আল্লাহকে পেতে হলে
নবী প্রেমিক হতে হবে,
নবীজীকে আঘাত দিলে
বাতিল বলে গণ্য হবে।
শুনরে ভাই মুসলমান
তাবলীগ থেকে সাবধান
ওরা মনগড়া কথা বলে
আঘাত করে নবীর শান।
যত বাতিল, মুনাফিক
ধিক, তাদেরে শত ধিক।
সাধারণ্যের অমূল্য ঈমান
কেড়ে নিচ্ছে বাতিল বেঈমান।
সরল সহজ মানুষ যারা
তাদের টার্গেট করেছে ওরা।
আলেম যত সুন্নীয়তের
ভুলেও কাছে যায় না তাঁদের।
মহাপাজী আর ধুরন্ধর
লেবাস-পোশাক কি সুন্দর
কথাবার্তা খুব মিষ্টি-মধুর
সুযোগ বুঝে পাল্টে নেয় সুর।
মুসলমানের মনে
ওরা জাগায় সংশয়।
আসলে ভাই ওরা কিন্তু
নবীজীর প্রেমিক নয়।
নবীর প্রেমিক হতে হলে
ইলিয়াসী তাবলীগ ফেলে,
এসো তোমরা তওবা করে
সুন্নীয়তের পতাকাতলে।

অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহ:) এর কিতাবসমূহ নিজে পড়ুন অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন। ঈমান-আক্বিদা মজবুত করুন।

পোঃ রেজিঃ নং- ডি এ ঢাকা ৫০২৮, ৩৭ তম সংখ্যা, মার্চ '১০ ইং, মূল্য ১২.০০ টাকা

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল সাহেবের লিখিত সুন্নী আক্বিদাসম্পন্ন বইগুলো পড়ুন এবং আক্বিদা শুদ্ধ করুন

বই	হাদিয়া
হায়াত মউত কবর হাশর	৪০০.০০
নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	২৫০.০০
আ'লা হযরতের 'ইরফানে শরিয়ত'	১৩০.০০
প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল	১২০.০০
ফতোয়ায়ে ছালাছীন বা ত্রিশ ফতোয়া	৮০.০০
আহকামুল মাযার	৮০.০০
শিয়া পরিচিতি	৬০.০০
মিলাদ ও কিয়ামের বিধান	৬০.০০
ফতোয়া ছালাছা	৩০.০০

বই	
বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত	(নিঃশেষ)
গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস	(নিঃশেষ)
ইসলাহে বেহেস্তী জেওর (সাদা)	(নিঃশেষ)
ফতোয়াউল হারামাঈন	(নিঃশেষ)
কালেমার হাকীকত	(নিঃশেষ)
কারামাতে গাউসুল আযম	(নিঃশেষ)
সফর নামা আজমীর	(নিঃশেষ)
ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লাহরী	(নিঃশেষ)
মহাসমর কাব্যের ব্যাখ্যা	(পান্ডুলিপি)

প্রাপ্তি ঠিকানা ঃ উজ্জীবন লাইব্রেরী, মাদ্রাসা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল : ০১৮১৫৪১০২৬২

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রব, "মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ, (২য় লেন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

বিঃদ্রঃ ৫০০০ টাকার পাইকারগণের জন্য ২০% কমিশন। ৫০০ টাকা হলে বিনা কমিশনে ভিপি করেও পাঠানো হয়।

সুন্নী মুবাল্লিগ ও সুন্নীবার্তার এজেন্সী ঠিকানা-২

- উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ঢাকা।
- গাউসুল আযম হাফেজিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা ও জামে মসজিদ, সকদী, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
- মাওঃ মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন, চতুরপুর বিজয়পুর, জেলা: বি-বাড়ীয়া।
- মোঃ শাহজাহান আলী, সলঙ্গা সাবরেজিষ্ট্রি অফিস, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ।
- কাওসার আহমদ দশম, হাজী আলিমুল্লাহ সিঃ মাদ্রাসা চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
- সৈয়দ মতিউর রহমান আশরাফী, ভায়ুবনী, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।
- মো ঃ জাহেদ আলী মেম্বার, গাচীহাটা, কিশোরগঞ্জ।
- ডাঃ আবদুল মোতালেব চৌধুরী, নবীনগর পশুহাসপাতাল, বি-বাড়ীয়া।
- মোঃ রফিকুল ইসলাম, গোড়ান, শান্তিপুর, ঢাকা-১২১৯।
- মোঃ আবদুল আজিজ, ১৭/৬ স্বামীবাগ লেন, ঢাকা- ১১০০
- মোঃ রাজিয়ুল ইসলাম (পিন্টু), বাসাব, ঢাকা-১২১৪
- মাওঃ আমিনুল ইসলাম জালালী, মুদাররিস, চারতলা ইস. মা, আশুগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া।
- মাওঃ নুরুল ইসলাম আল-কাদেরী, গাউছিয়া খানকা শরীফ, কাউরিয়া পাড়া, নরসিংদী।
- মোঃ আবু তাহের, গ্রাম মঙ্গলপুর, পোঃ তাজগঞ্জ বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ
- মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান শাহ, মদিনাতুল উলুম কা.হা.মাদ্রাসা ও এতিমখানা,সাদুল্লাপুর,সাভার।
- মোঃ আবদুর রহমান, ইবি এনপিএস, রতনপুর, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
- মোঃ আলি আশ্রাফ, নিজ মেহার (চৌধুরী বাড়ী), শাহরাস্তী, চাঁদপুর।
- মোঃ শরীফ উদ্দীন, প্রযত্নে- কামাল সওদাগর, গ্রাম+পোষ্ট সন্দীপ, চট্টগ্রাম।
- জোহাদিয়া কর্ণার, জামেয়া আহমদিয়া ছুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
- আজিজুল ইসলাম খাঁন, মাসুদ- রেযা লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী, হবিগঞ্জ।
- হাফেয মোঃ আতাউর রহমান, ৪৩/১ কায়েতটুলি খানকা শরীফ, ঢাকা-১০০০।
- আলহাজ্ব শফিকুর রহমান পাটোয়ারী, কোষাধ্যক্ষ, শান্তিপুর মসজিদ কমিটি, ঢাকা-১২১৪।
- খানকায়ে গাউছিয়া কাদেরীয়া শরীফ , তিনগাও, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।
- ডাঃ আবদুল করিম, ইসলামিয়া লাব্রেরী, পীরগাজর, সাতক্ষীরা।
- মাওঃ আব্দুল কাইউম, নোমান ষ্টোর, পুটিজুড়ি বাজার, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
- মোঃ আজিম চৌধুরী, ১৩২/১/এ, আহমদবাগ, ঢাকা-১২১৪।
- পীরে তরিকত আল্লামা মজিবুল হক, মোহাম্মদীয়া এতিমখানা কমপ্লেক্স, রামগঞ্জ, লক্ষীপুর।
- মাওঃ মোঃ মঈনউদ্দীন আক্তারী, শামসুল উলুম গাউছিয়া সুন্নীয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা, বি-বাড়িয়া।
- দুলালপুর গাউছিয়া দরবার শরীফ, প্রযত্নে পীরেতরিকত আল্লামা সেকান্দর হোসেন আল কাদেরী, হোমনা, কুমিল্লা।
- ফরিদা রহমান খান, রোড নং ৮, বাড়ী নং ৫, গুলশান, ঢাকা।
- কাজী মাহবুবুর রহমান, শাইসলামপুর (কাজী বাড়ী), বি-বাড়িয়া।
- MD. AHMED CHOWDHURY, 14 Bread Field Court, Hawley Road, Camdentown, London, NW1-8Rn U.K. Ph. 02072843136
- MD. AHAD MIAH, 124 Sand Well Street, Caldmore ,Walsall Wsl-3Eg West Midlands, U.K. Ph. 01922-639817
- MR. MAKADDUS MIAH, All Seasons Dry Cleaning & Landuary 147/A Caldmore Road, Walsall, WSI 3RF Uk. Ph 01922-620093
- SYED MOSTAQUE MIAH, 41, Napier Street West, Oldham, OL8-4AE Uk. Ph. 0161-6270119
- MR. ABDUL WAHID, 44-17-25 Th Ave (2Nd Floor) Astoria, NY-11103 U.S.A. Tel : 718-6267695
- ALHAJ ANFORUL ISLAM, 56 A, Glen Burn Road, Kings Wood, Bristol, BS15-IDP-U.K. Ph. 01179610560
- MD. MUZIBUR RAHMAN, 95, Wills Street, Lozells, Birmingham, B19-2AL, Uk
- SYED WAISUR REZA, 18, Normanton Drive, Lough Borough LE-11-INT, U.K. Ph. 01509264582
- MD. ANWAR MIAH, 152 Winsor Road, Off. Country Road, Hull, Hu5-4 HH, North Hamber Side, U.K, Phone : 01482-657814
- MD.SAIFUR RAHMAN KHAN, Shiefield,S9-4Rh,U.K
- S.M. HASSAN, 68, Parkfield St. RushLome ,Manchester
- SHUHELUL HAQUE, Southport, 01704380574.
- M.A. HOSSAIN, 96, Normunt Rd. Fenham, New Castle Upontyne, NE4-8SH, Uk, Tel : 0191-226017
- CHOMOK ALI, 358 Stani Forth Road, (Darnall) Shefield, S93Fu, U.K. Tel : 00114-242261
- SYED MOHAMMAD ALI, 24 Stubbington Avenue, Northend, Portsmouth, Po2-OHT, Uk. Ph 02392662270
- ABUL KASHEM MALIK, 36 Priston Ville Road, Brighton, BN1-3Tj Uk. Ph. 01273820628.
- MR. SHAHABUDDIN, 101, Brook Drive, London, SE11-4TU, Uk. Ph. 02077359744
- SYED MUQTASID, 32 Brougham St, Burnley, Lancashire, BB12-OAS, Uk. Ph- 01282-623138
- ASHIK UDDIN, 142 Nottingham Road, Loughborough, LE11-1Ex, Uk. Ph 01509-269109
- MR. KHAIRUL BASHAR (SHAJ), 24 Albart Walk North Wool Wich, E16-2NI, Uk. Tel : 0207-4733514
- MR. SALIK MIAH, 27 Nelson Road, Aston, Birmingham, Ph. 0121-3275564
- ABDUL MALIK, S-Deburgh Street,Riverside, Cardiff,Uk. Ph : 01920220386
- ZIAUR RAHMAN, Birmingham, B19-1HG, UK. Tel : 0121-5519495
- SM. MIZANUR RAHAMAN, Po Boux No 345, Buraydah,K.S.A

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমীন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com, Websote: http:// Sunnibarta.wordpress.com